ক্রমশ জোরালো হয়ে ওঠে।

1.1.1 গণপরিষদ গঠনের প্রেক্ষাপট

এদিকে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে যুদ্ধে বিপন্ন ব্রিটিশ সরকার ব্রিটেনের যুদ্ধ প্রয়াসের পক্ষে ভারতীয় জনগণের সমর্থন পাওয়ার আশায় ভারতীয়দের গণপরিষদ গঠনের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন এবং ১৯৪০ সালের ৮ আগস্ট তারিখে ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো তাঁর বিখ্যাত 'আগস্ট ঘোষণা'য় ভারতের সংবিধান রচনার বিষয়টিকে ভারতীয়দের একান্তই নিজস্ব বিষয় বলে স্বীকার করে নেন। এরপর ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত রাজনৈতিক সমস্যাটির সমাধান করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ সরকার স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের নেতৃত্বে ভারতে একটি মিশন ('ক্রিপস মিশন' তাকে) প্রেরণ করেন, যদিও 'ক্রিপস মিশন'-এর প্রস্তাবে ভারতকে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দানের প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভারতকে **'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' ('Dominion Status')** বা **'স্বশাসিত ব্রিটিশ এলাকার মর্যাদা'** দানের ইঙ্গিত থাকায় তাকে মেনে নেওয়া ভারতীয়দের পক্ষে সম্ভব হয়নি এবং এর ফলে 'ক্রিপস মিশন' স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হয়ে যায়।

'ক্রিপস মিশন' ব্যর্থ হয়ে গেলে কিছুকাল চুপচাপ থাকার পর ব্রিটিশ সরকার আবার ব্রিটেনের যুদ্ধ প্রয়াসের পক্ষে ভারতীয় জনগণের মানসিকতা জয় করা ও তাদের সমর্থন পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন এবং এই লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর তারিখে ব্রিটিশ বড়োলাট লর্ড ওয়াভেল ভারতের প্রদেশগুলির

PDF Scanner ACE Scanner

আইনসভাসমূহের নির্বাচনের পরে ভারতীয়দের দাবিমতো একটি গণপরিষদ গঠন ও ভারতের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন। এর পর-পরই ব্রিটিশ সরকার এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালে ভারতকে স্বাধীনতা দান সংক্রান্ত বিষয়টির নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ভারতবর্ষে **ক্যাবিনেট মিশন** বা **মন্ত্রিমিশন** প্রেরণ করেন। এই মিশনই তপশিলি এসে ওই বিষয়ে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং ভারতীয়দের দাবিমতো গণপরিষদ গঠনের সুপারিশ করেন।

ক্যাবিনেট মিশন তার সুপারিশে একথা ঘোষণা করে যে, ভারতবর্ষের গণপরিষদ ভারতীয় প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সম্প্রদায়গত ভিত্তিতে সমানুপাতিক ভোট পদ্ধতিতে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হবে। এবং সেইমতো গণপরিষদ গঠনের জন্য প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে কংগ্রেস দল ৫৮% আসন দখল করে অর্থাৎ প্রাদেশিক আইনসভাগুলির ১৫৮৫টি আসনের মধ্যে ৯২৩টি আসনে কংগ্রেস দল জয়লাভ করে এবং মুসলিম লিগ দলটি মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৪৩২টি আসনের মধ্যে ৪২৫টি আসনে জয়লাভ করে।

এরপর ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ মতো ১৯৪৬ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে প্রদেশিক আইনসভাগুলির সদস্যদের দ্বারা সম্ভাব্য গণপরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচিত করার জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ মতো প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের দ্বারা গণপরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হওয়ার কারণে মুসলমান ও শিখদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলিকে বাদ দিয়ে বাকি সাধারণ আসনগুলিতে কংগ্রেস দল স্বাভাবিকভাবেই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং আসন সংখ্যার হিসাবে গণপরিষদের ২৯৬টি আসনের মধ্যে ২০৮টি অর্থাৎ ৭০% আসন কংগ্রেস দল লাভ করে। তদানীন্তন ভারতবর্ষের দেশীয় রাজন্যবর্গ ৯৩ জন প্রতিনিধিকে মনোনয়নের ভিত্তিতে গণপরিষদে প্রেরণ করেন। এইভাবে প্রাদেশিক আইনসভা-সমূহের দ্বারা নির্বাচিত ২৯৬ জন প্রতিনিধি এবং রাজন্যবর্গের দ্বারা মনোনীত ৯৩ জন প্রতিনিধি অর্থাৎ মোট ৩৮৯ জন সদস্যকে নিয়ে গণপরিষদ গড়ে ওঠে।

এরপর ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন তারিখে বড়োলাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী **'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আইন, ১৯৪৭' (Independence of India Act, 1947)** পাশ হওয়ার পর ভারতীয় গণপরিষদ সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে এবং তপশিলির পক্ষে সার্বভৌম সংস্থা হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে।

1.1.2 গণপরিষদের কাজ

ভারতীয় সংবিধান রচনা : ভারতীয় গণপরিষদের প্রধান কাজ ছিল স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ভারত যাতে স্বাধীনভাবে নিজের প্রশাসন নিজেই পরিচালনা করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান সম্বলিত স্বাধীন সংবিধান রচনা করা এবং তার মাধ্যমে ভারতকে প্রশাসনিক সুস্থতা দান করা। এই উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের জন্য সংবিধান রচনা করার লক্ষ্যে গণপরিষদকে নানা অধিবেশনে মিলিত হতে হয়। এবং সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্ক, প্রস্তাব-পাল্টা প্রস্তাবের উপস্থাপনা ইত্যাদির জটিল পান্ডিত্যপূর্ণ পথ পরিক্রমার মাধ্যমে অবশেষে ভারতীয় গণপরিষদ স্বাধীন ভারতের জন্য মৌলিক সংবিধান রচনা করার কাজটি সম্পাদন করে।

◆ **সংবিধান রচনা : প্রথম অধিবেশন :** ভারতীয় সংবিধান রচনার লক্ষ্যে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর তারিখে এবং তা সমাপ্ত হয় ২৩ ডিসেম্বর তারিখে। এই অধিবেশনে সচ্চিদানন্দ সিংহকে গণপরিষদের অস্থায়ী সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। এই অধিবেশনের তৃতীয় দিনে ড. রাজেন্দ্র প্রসাদকে গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। অধিবেশনের চতুর্থ দিনে সভার কার্যবিবরণী সংক্রান্ত কমিটি নির্বাচিত হয়। পঞ্চম দিনে জওহরলাল নেহরুর প্রস্তাব মতো ভারতকে "সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" বা "Sovereign Democratic Republic" হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এভাবেই ভারতীয় সংবিধান রচনার লক্ষ্যে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

PDF Scanner ACE Scanner

◆ **দ্বিতীয় অধিবেশন** : গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে ১৯৪৭ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে। এই অধিবেশনে ভাবী স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সুপারিশ দানের জন্য পরিকল্পনা কমিটি, উপদেষ্টা কমিটি, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটি, মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কমিটি, উপজাতি এলাকা সংক্রান্ত কমিটি প্রভৃতি কমিটি নির্বাচিত হয়। এই সব কমিটির নিজ নিজ বিভাগীয় বিষয় সংক্রান্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে ভারতীয় সংবিধানের নানা বিধিবিধান রচিত হয়। এইভাবে গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

◆ **তৃতীয় অধিবেশন** : গণপরিষদের তৃতীয় অধিবেশন বসে ১৯৪৭ সালের ২৮ এপ্রিল থেকে ২ মে পর্যন্ত সময়ে। এই অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটি ভারতের ভাবী কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, যোগাযোগ-পরিবহণ, অর্থনীতি প্রভৃতি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অর্পণ করার সুপারিশ করেন। তা ছাড়া মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কমিটি একদিকে **'মৌলিক অধিকার'** নামে আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য অধিকার এবং অন্যদিকে **'নির্দেশমূলক নীতি'** নামে আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয় এরূপ নির্দেশমূলক নীতি-প্রসূত অধিকার—এই দুই প্রকার অধিকার ভারতীয় জনগণকে দেওয়ার কথা প্রস্তাব করেন। তা ছাড়া এই কমিটি জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষদের জন্মস্থান নির্বিশেষে সকল ভারতীয়কেই মৌলিক অধিকার দেওয়ার সুপারিশ করেন। এই তৃতীয় অধিবেশনেই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের প্রস্তাবও গৃহীত হয় এবং তপশিলি জাতির প্রতি সুবিচার করার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়। এইভাবেই গণপরিষদের তৃতীয় অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

◆ **চতুর্থ অধিবেশন** : এরপর ১৯৪৭ সালের ১৪ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত সময়ে গণপরিষদের চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে গণপরিষদের প্রস্তাবিত সংবিধান বিষয়ক কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটি এবং প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা সংক্রান্ত কমিটি—এই কমিটি দুটির সুপারিশ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া এই অধিবেশনে ভারতের জাতীয় পতাকা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি অ্যাডহক (অস্থায়ী) কমিটি নিয়োগ করা হয়।

◆ **ভারতে স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও গণপরিষদের বিশেষ জরুরি অধিবেশন** : এদিকে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট তারিখের মধ্যরাতে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে স্বাধীনতা লাভের সেই রোমাঞ্চকর মুহূর্তে ভারতীয় গণপরিষদের এক জরুরি অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রশাসনিক রীতিনীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা হয়। এই প্রকার প্রশাসনিক রীতিনীতি সম্বলিত ভারতীয় সংবিধানকে দ্রুত রচনা করারও সিদ্ধান্ত এই অধিবেশনে গ্রহণ করা হয়।

◆ **স্বাভাবিক পঞ্চম অধিবেশন** : এরপর ১৯৪৭ সালের ২০ আগস্ট থেকে ২৯ আগস্ট তারিখ পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় গণপরিষদের চতুর্থ অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে গণপরিষদের কাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য একজন **অধ্যক্ষ (Speaker)** নিয়োগের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

এরপর ১৯৪৭ সালের ১৭ নভেম্বর তারিখে গণপরিষদ সর্বপ্রথম **ডোমিনিয়ন পার্লামেন্ট** বা **সংসদ** হিসাবে কাজ শুরু করে এবং জি.ভি. মভলঙ্কর মহাশয়কে গণপরিষদের সর্বপ্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

PDF Scanner ACE Scanner

উত্তর। শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ ঃ

শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ—

(১) বৃহত্তম গণতন্ত্র ঃ বিশ শতকের মাঝামাঝি ভারতীয় জনগণ নিজেদের জন্য যে সংবিধানের সৃষ্টি করলেন তা নতুন না হলেও অভিনব বলা যেতে পারে। প্রথমত, স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র রচনায় নেতৃবৃন্দ পৃথিবীর বিভিন্ন শাসনতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি নিয়ে এক সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ শাসনতন্ত্র রচনার চেষ্টা করেছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করে ওই সকল শাসনব্যবস্থার বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্রের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি পরিহার করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলির পৃথক পৃথক শাসনতন্ত্র রয়েছে; মার্কিন শাসনতন্ত্র কেবলমাত্র জাতীয় সরকার (National Government) সম্পর্কিত। কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার—উভয় সরকার সম্পর্কেই বিস্তৃত নির্দেশ রয়েছে। তাছাড়া ভারতীয় শাসনতন্ত্র গ্রেট ব্রিটেনের মতো অলিখিত নয়; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং সুইজারল্যান্ডের মতো লিখিত শাসনতন্ত্র। ভারতীয় শাসনতন্ত্র পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম শাসনতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। একে শাসনতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে মূল ৩৯৫টি ধারা

Articles), ১০টি তালিকা (Schedule) এবং বিভিন্ন সংশোধনসহ বিশালাকার হয়ে পড়েছে। ২০০২ সাল পর্যন্ত শাসনতন্ত্রের ৪৪৩টি ধারা (২২টি ভাগে বিভক্ত), ১২টি তালিকা (Schedule) এবং ৮৬টি সংশোধনসহ এটি পৃথিবীর এক বৃহত্তম শাসনতন্ত্রে পরিণত হয়েছে। ১৯৫০ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে অনেকগুলি ধারা বাতিল করা হয়েছে। ৬৪টি নতুন ধারা এবং ৪টি তালিকা শাসনতন্ত্রে যুক্ত হয়েছে। **বিচারপতি মহাজন** (J. Mahajan) বলেছেন, "ভারতবর্ষের মতো পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এমন বৃহদাকার শাসনতন্ত্র নেই।" ২০১১ (জানুয়ারি) পর্যন্ত ৯৬টি সংশোধন গৃহীত হয়েছে।

(২) **সার্বভৌম গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র ঃ** শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতবর্ষ প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, অভ্যন্তরীণ ও বহির্ব্যাপারে কোনো শক্তির অধীন নয়। এই শাসনতন্ত্রকে গণতন্ত্র বলা যায়। কারণ, প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ভারতবাসীর ভোটাধিকার নীতির স্বীকৃতিকে একটি বিপ্লবাত্মক সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি করার ফলে এটি সাধারণতন্ত্র হিসেবে পরিচিত।

(৩) **মৌলিক অধিকার ঃ** গণতন্ত্রের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে শাসনতন্ত্রে কতকগুলি মৌলিক অধিকারের (Fundamental Rights) অন্তর্ভুক্তি। ব্যক্তির বিকাশের জন্য, সহজ জীবনযাপনের জন্য এই অধিকারগুলি অবশ্যক, অধিকার ছাড়া গণতন্ত্র বাঁচতে পারে না। অধিকারের মাধ্যমেই রাষ্ট্রশক্তির যথার্থ মূল্যায়ন হয় ("A State is known by the system of rights it maintains."—*Laski*)। ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারগুলি হল ঃ (১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) ধর্মাচরণের অধিকার, (৫) শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকার এবং (৬) শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার। অবশ্য ভারতীয় শাসনতন্ত্রের এই অধিকারগুলি অবাধ নয়; বিভিন্ন অধিকারগুলির সীমা আরোপ করা হয়েছে।

(৪) **নির্দেশমূলক নীতি ঃ** ভারতীয় শাসনতন্ত্রের অন্য একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য হল যে, এতে মৌলিক অধিকারের সঙ্গে কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতিরও (Directive Principles) উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আয়ারল্যান্ডের শাসনতন্ত্রের অনুসরণ করা হয়েছে। নির্দেশমূলক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারের মতো আদালতে বলবৎযোগ্য নয়। নির্দেশমূলক নীতিগুলি শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য ও আদর্শের পরিচয় বহন করে। এই নীতিগুলির প্রকৃতি প্রধানত অর্থনৈতিক অধিকারের সমতুল্য। উদাহরণস্বরূপ কর্মের অধিকার, বেকার, বার্ধক্য, অঙ্গহানি ও পীড়িতাবস্থায় সরকারি সাহায্য পাওয়ার অধিকার ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে।

(৫) **মৌলিক কর্তব্য ঃ** ভারতীয় শাসনতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি নাগরিকের মৌলিক কর্তব্যের সংযোজন। শাসনতন্ত্রের ৪২তম সংশোধন দ্বারা মৌলিক কর্তব্যসমূহ শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

(৬) **যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র ঃ** ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বলা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতীয় শাসনতন্ত্রে স্থানলাভ করেছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্র লিখিত এবং শাসনতন্ত্র তিনটি তালিকার (ইউনিয়ন, রাজ্য ও যুগ্ম তালিকা) মাধ্যমে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়েছে। অবশ্য কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের পদ্ধতি বিচার করলে দেখা যায় যে, অঙ্গরাজ্যের আইনসভার আইনের সঙ্গে পার্লামেন্টের আইনের অসঙ্গতি দেখা দিলে পার্লামেন্টের আইনই প্রাধান্য লাভ করে। সুতরাং, এদিক থেকে কেন্দ্রীয় প্রাধান্যের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা হলেও ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন দিক লক্ষ করা যায়, যথা—রাষ্ট্রপতির শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণার ক্ষমতা, রাজ্য আইনসভার প্রণীত বিল নাকচ করার ক্ষমতা, ইউনিয়ন সরকার কর্তৃক রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দানের ক্ষমতা এবং আর্থিক সাহায্যের জন্য অঙ্গরাজ্যগুলির কেন্দ্রের ওপর নির্ভরশীলতা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সূচনা করে। সুতরাং, অনেকে মনে করেন যে, প্রকৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও ভারতীয় শাসনতন্ত্রে কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা রয়েছে।

(৭) **সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয়তার সমন্বয় :** শাসনতন্ত্রের দুষ্পরিবর্তনীয়তা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। ক্ষমতা বণ্টন সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলা যেতে পারে। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা বণ্টন, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, ইউনিয়ন ও রাজ্যগুলির শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা প্রভৃতি বিষয়ে শাসনতন্ত্র সংশোধন করতে হলে অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভার সম্মতি প্রয়োজন। আবার কতকগুলি ধারার পরিবর্তনের জন্য পার্লামেন্টের মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি নিলেই চলে, অঙ্গরাজ্যগুলির অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। আবার কতকগুলি বিষয় আছে, যা পার্লামেন্ট সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতিতে পরিবর্তন করতে পারে। সুতরাং, সামগ্রিক বিচারে ভারতীয় শাসনতন্ত্রকে সুপরিবর্তনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তার সমন্বয় বলা যেতে পারে।

(৮) **সুপ্রিম কোর্টের মর্যাদা :** ভারতীয় শাসনতন্ত্রে সুপ্রিম কোর্ট বা প্রধান-বিচারালয়কেই যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসেবে সংগঠিত করা হয়েছে। ইউনিয়ন ও অঙ্গরাজ্যগুলি, অথবা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বৈধ অধিকার সম্পর্কিত বিবাদের নিষ্পত্তি করার এবং মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতার দিক থেকে সুপ্রিম কোর্ট ইংল্যান্ডের ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিচারালয়ের মধ্যস্থান অধিকার করে।

(৯) **সংসদীয় শাসনব্যবস্থা :** ভারতীয় শাসনতন্ত্র ইংল্যান্ডের ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থা অনুকরণে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলিতে ক্যাবিনেট বা সংসদীয় শাসনব্যবস্থা (Cabinet or Parliamentary System) প্রবর্তন করেছে। ভারতের রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল নিয়মতান্ত্রিক শাসকের মর্যাদাসম্পন্ন; প্রকৃত শাসনক্ষমতা রয়েছে মন্ত্রীসভা ও ক্যাবিনেটের হাতে। মন্ত্রীগণ শাসন পরিচালনার জন্য আইনসভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল। মন্ত্রীগণের দায়িত্বশীলতা ক্যাবিনেট শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। আবার সংসদীয় বা পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারি দলের সঙ্গে সংঘবদ্ধ বিরোধী দলেরও প্রয়োজন আছে।

(১০) **দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ :** ভারতীয় শাসনতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, পূর্বতন দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হয়ে শাসনতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীনে এসেছে। দেশীয় রাজ্যগুলির বর্তমানে আর কোনো পৃথক সত্তা নেই।

(১১) **বিভিন্ন রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা :** ভারতীয় শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাজ্যের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সত্ত্বেও কতকগুলি ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর সম্পর্কে ৩৭০ নং ধারার মাধ্যমে বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। নাগাল্যান্ড, অসম, মণিপুর, সিকিম প্রভৃতি রাজ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নতুন ধারার মাধ্যমে [৩৭১-৩৭১(চ)] সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

(১২) **ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র :** ভারতীয় শাসনতন্ত্রে ভারতবর্ষকে ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) রাষ্ট্র হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতার মূলকথা হল কোনোরকম রাষ্ট্রীয় ধর্মের (State religion) অনুপস্থিতি। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি **ড. আর. ভেঙ্কটরমন** (Dr. R. Venkataraman) বলেছেন, "রাষ্ট্র কোনো ধর্মের পরিপোষক নয়, কোনো ধর্মের বিরোধীও নয়, এমনকি অধার্মিকতার আশ্রয়স্থলও নয়। সকল প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কার্যকলাপ থেকে সম্পর্করহিত থেকে ধর্ম সম্পর্কে রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে।"

(১৩) **সংরক্ষণ ব্যবস্থা :** ভারতীয় শাসনতন্ত্রে অনুন্নত শ্রেণির উন্নতিকল্পে বিশেষ সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। আইনসভায় আসন সংরক্ষণ, সরকারি চাকুরিতে অগ্রাধিকার এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তার কথা বলা হয়েছে। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থা ৬২তম সংশোধন আইন (১৯৯০) দ্বারা সংরক্ষণ ব্যবস্থার মেয়াদ আরও ১০ বছর অর্থাৎ, ২০০০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ২০০০ সালে সংবিধান সংশোধন করে এই ব্যবস্থা আরও ১০ বছর বাড়ান হয়েছে।

(১৪) **এক নাগরিকত্ব :** ভারতীয় শাসনতন্ত্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা যেতে

case, this point was reiterated by justice Mathew in Indira Nehru Gandhi V. Raj Narain (1975)."

৪.৩. ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble to the Constitution of India)

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে ঃ "আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক , ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র হিসাবে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার ; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা; মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতা সৃষ্টি এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য যাতে সৌভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে উঠে, তার জন্য আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি। "

("**WE THE PEOPLE OF INDIA,** having solemnly resolved to constitute India into a **Sovereign Socialist Secular Democratic Republic** and to secure to all its citizens :

JUSTICE, social, economic and political ;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship ;

EQUALITY of status and of opportunity ;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation ;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do hereby **ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.**"

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা ও তার তাৎপর্য

সংবিধানের ভূমিকা বা চাবিকাঠি	প্রস্তাবনা
রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রকৃতি	"আমরা ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র হিসাবে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিকদের জন্য
রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শ	সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার; চিন্তা, মত প্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা; মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতা সৃষ্টি এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিত করার জন্য যাতে সৌভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে উঠে, তার জন্য
সংবিধানের উৎস ও সংবিধান গ্রহণের তারিখ	আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে (১৯৪৬) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৩ই ডিসেম্বর জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ সম্বলিত এক প্রস্তাব (Objective Resolution) উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবে সংবিধানের উদ্দেশ্য ও দর্শন সম্পর্কে উল্লেখ ছিল। প্রস্তাবগুলি ২২শে ডিসেম্বর অনুমোদিত হয়। বস্তুতপক্ষে এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা প্রণীত হয়েছে। মূল

ACE Scanner

সংবিধানের প্রস্তাবনাটির সঙ্গে কিছু সংযোজন ঘটেছে। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনার গোড়ার দিকে 'সমাজতন্ত্র' (Socialist) ও ধর্মনিরপেক্ষ' (Secular) এবং শেষের দিকে 'সংহতি' (Integrity) শব্দগুলি সংযুক্ত হয়েছে। এই শব্দগুলি মূল প্রস্তাবনায় ছিল না।

বক্তব্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনাটিকে দু'টি মূল অংশে বিভক্ত করা যায়। প্রস্তাবনার প্রথম অংশে সংবিধানের উৎস এবং দ্বিতীয় অংশে সংবিধানের মূল উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে।

(ক) **আমরা ভারতের জনগণ (WE, THE PEOPLE OF INDIA)** প্রস্তাবনার শুরুতেই "আমরা ভারতের জনগণ" শব্দগুলো সংযুক্ত হয়েছে। প্রস্তাবনাটি শুরু হয়েছে "আমরা ভারতের জনগণ" বলে এবং শেষ হয়েছে এই বলে "আমাদের গণপরিষদে আজ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর এই সংবিধান গ্রহণ ও বিধিবদ্ধ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।" এর মাধ্যমে সংবিধানের উৎস ও অনুমোদন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রস্তাবনায় গণ-সার্বভৌমিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ভারতীয় জনগণই হল সংবিধানের উৎস ও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। জনগণের সার্বভৌম ইচ্ছাই হল সংবিধানের আইনগত ভিত্তি। তাই এই সংবিধান মানতে প্রত্যেকে বাধ্য। ভারতের সুপ্রীম কোর্টও এই ব্যাখ্যা সমর্থন করেছে (**ভারত সরকার** বনাম **মদনগোপাল, ১৯৫৪**)। এই মামলায় সুপ্রীম কোর্টের অভিমত অনুসারে বলা হয়, প্রস্তাবনার মাধ্যমে প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতের সংবিধান জনগণের কাছে কর্তৃত্ব পেয়েছে। আবার দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য নৈতিক দিক থেকেও জনগণ সংবিধানকে মেনে নিতে বাধ্য। জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত ও গৃহীত সংবিধানকে মান্য করতে জনগণ নীতিগতভাবে বাধ্য। সংবিধান হল দেশের মৌলিক বা চরম আইন (Fundamental or Supreme Law)। একে অমান্য করলে দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। গণপরিষদে ড. আম্বেদকর (B. R. Ambedkar) মন্তব্য করছেন ঃ "This Constitution has its roots in the people and it derives its authority from the people." অধ্যাপক হোয়ার (K. C. Wheare) বলেছেন ঃ "...in the moral sphere it is sometimes argued that a constitution commands obligation because it expresses the will of the people."

eignty."

(খ) সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র (SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC)

প্রস্তাবনায় ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। প্রস্তাবনায় প্রতিটি শব্দ তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই প্রতিটি শব্দ নিয়ে পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা আবশ্যক।

সার্বভৌম কথাটির অর্থ হল ভারত আভ্যন্তরীণ এবং বহির্ব্যাপারে সকল রকম বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত। সার্বভৌমিকতা বলতে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতাকে বোঝায়। এর দুটি দিক আছে ঃ আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক। আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতার অর্থ হল রাষ্ট্রের রাজ্যক্ষেত্রের মধ্যে রাষ্ট্রের আইন হল চরম, চূড়ান্ত

PDF Scanner ACE Scanner

ও অবাধ। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে এর ঊর্ধ্বে বা বাইরে কেউ থাকতে পারে না। বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা বলতে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণবিহীনতাকে বোঝায়। অধ্যাপক গেটেল প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এক্ষেত্রে 'স্বাধীনতা' শব্দ ব্যবহার করার পক্ষপাতী। যাইহোক ভারত আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় অর্থেই পরিপূর্ণভাবে সার্বভৌম।

সার্বভৌম

ভারতের ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রীয় আইন চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত ভাবে কার্যকর হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারত বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে সর্বপ্রকারে মুক্ত। স্বাধীনভাবে ভারত সরকার তার পররাষ্ট্র নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে। অধ্যাপক জোহারীর মতানুসারে ভারত যে প্রকৃতই সার্বভৌম তার বড় প্রমাণ হল ভারতের সংবিধান ভারতীয়দের দ্বারা রচিত হয়েছে। অধ্যাপক জোহারী (J. C. Johari) বলেছেন : "The very fact that the Constitution of India has been made by 'We, the People of India' lays down the doctrine of the ultimate sovereignty of the people of this country." ব্রিটিশ ভারতের অন্যান্য শাসনতান্ত্রিক আইনগুলির মত কোন বিদেশী কর্তৃপক্ষ এই সংবিধান প্রণয়ন বা প্রয়োগ করেনি।

...সদস্যপদ; আন্তর্জাতিক সান্ধচুক্তি, সম্মেলন, সমঝোতা ইত্যাদি।

মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি ছিল না। ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন অনুসারে ভারতকে **সমাজতান্ত্রিক** রাষ্ট্র হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। কিন্তু কি ধরনের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে সংবিধানে কিছু বলা নেই। সমাজতন্ত্রের মূল বক্তব্য অনুসারে উৎপাদনের উৎসগুলির সামাজিক মালিকানা এবং উৎপন্ন সামাজিক দ্রব্যসামগ্রীর সামাজিক মালিকানায় বণ্টন-ব্যবস্থাকে বোঝায়। মরিস কর্নফোর্থ (Maurice Cornforth) বলেছেন ঃ "Socialism is the social ownership of the means of production and their utilization to satisfy the material and cultural requirements of the whole society." ভারতে কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়নি। এখানে

সমাজতান্ত্রিক

সমাজতন্ত্র শব্দটি গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা দরকার। দারিদ্র্যমোচন ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যেই ভারতীয় সমাজতন্ত্রের মূল নিহিত আছে। গজেন্দ্রগাদকার (P. B. Gajendragadkar) বলেছেন ঃ "India is committed to the ideal of the welfare-state and must establish socio-economic justice." অবাধ ধনতন্ত্রের পরিবর্তে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মাধ্যমে মিশ্র অর্থনীতি গড়ে তোলা এবং উন্নয়নের সঙ্গে ন্যায়বিচারকে সংযুক্ত করাই হল এর মূল উদ্দেশ্য। ভারতের সংবিধানের বিভিন্ন জায়গায় জনকল্যাণমূলক বিভিন্ন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক অধিকারের কথা বলা হয়েছে। ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে সাধারণ আইনগত অধিকার হিসাবে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ৩০০(ক) ধারায় স্বীকৃত হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শিল্পবাণিজ্য ভারতে বর্তমান। অর্থাৎ 'মিশ্র অর্থনীতি' (Mixed Economy) স্বীকার করা হয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করার উদ্দেশ্যে কিছু সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের ব্যবস্থাদি গৃহীত হয়েছে। সর্দার স্মরণ সিং প্রমুখ-র মতে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মৌলিক অধিকারের থেকে নির্দেশমূলক নীতির গুরুত্ব বৃদ্ধি করে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে প্রগতিমূলক পরিবর্তনের ব্যবস্থা করে ভারত সরকার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আন্তরিক সদিচ্ছার পরিচয় দিয়েছে। সংবিধান বিশারদ কাশ্যপ (S. C. Kashyap) তাঁর *Our Constitution* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ "The text of the Preamble as amended gives almost the highest place of honour to the objective of 'socialism'. It is mentioned next only to 'sovereign'. However, the term 'socialism' has not been defined by the Constitution."

বিচারপতি পি. বি. মুখার্জী প্রস্তাবনায় সমাজতন্ত্র কথাটির অন্তর্ভুক্তির সমালোচনা করেছেন। (১) 'সমাজতন্ত্র' মূলতঃ একটি রাজনৈতিক আদর্শ। ভারতের মত উদারনৈতিক দেশের

সমালোচনা

সংবিধানের প্রস্তাবনায় এর অন্তর্ভুক্তি অনুচিত। (২) ভারতের সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বীকৃত সামাজিক-অর্থনৈতিক আদর্শ সংযুক্ত হয়নি। (৩) বাস্তবে যে আদর্শকে যথাযথভাবে কার্যকরী

ACE Scanner

করা একরকম অসম্ভব তাকে প্রস্তাবনার মূল নীতির অন্তর্ভুক্ত করলে সত্যের অপলাপ করা হয়। (৪) প্রস্তাবনার 'সমাজতান্ত্রিক' শব্দটি অস্পষ্টতা দোষে দুষ্ট।

সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে **'ধর্মনিরপেক্ষ'** শব্দটিও প্রস্তাবনায় সংযুক্ত হয়েছে। এর অর্থ হল রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবে না। ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য করবে না। ধর্মের ব্যাপারে রাষ্ট্র হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ ধারায় ধর্মীয় স্বাধীনতার মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে। ভারত রাষ্ট্রের লক্ষ্য হল সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা এবং ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। ভারতে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে কিছু নেই। ভারত রাষ্ট্র কোন বিশেষ ধর্মমতের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়। এখানে ধর্মকে ব্যক্তির বিবেক ও বিশ্বাসের বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়। পানিক্কর (K. M. Panikkar) তাঁর *The Foundations of New India* গ্রন্থে বলেছেন যে ভারতে ধর্মের দ্বারা রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপকে প্রভাবিত হতে দেওয়া হয় না।

ধর্মনিরপেক্ষ

ভারতে বহু ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি বসবাস করে আসছেন। ধর্মীয় সম্প্রীতি ভারতের বরাবরের আদর্শ। বস্তুতঃ ধর্মনিরপেক্ষতা সনাতন ভারতের প্রাচীন আদর্শ। ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে প্রস্তাবনায় 'ধর্মনিরপেক্ষ' শব্দটি সংযুক্ত হয়েছে এবং ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে তার আগেও এবং প্রকৃতপক্ষে বরাবরই ভারতে এ দেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার যাবতীয় উপাদান বর্তমান ছিল। ভারতের জাতীয় সংহতিকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনী আইনে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই আদর্শ ভারতে যথেষ্ট সফল হয়েছে। দেশবাসীদের মধ্যে ১৪ শতাংশ মুসলমান সম্প্রদায় থেকে তিনবার ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ডঃ জাকির হোসেন, ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ এবং এ. পি. জে. আবদুল কালাম ভারতের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদে নির্বাচিত হয়েছেন। তেমনি আবার উপ-রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচিত হয়েছেন ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি হিদায়েতুল্লা। এই ঘটনার মধ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতার সাফল্য নিহিত আছে।

কাশ্যপ (S. C. Kashyap) এ বিষয়ে বলেছেন যে, ভারতের সংবিধানের ১৪-১৬,

সৌভ্রাত্রের নীতির মাধ্যমে এই অঙ্গীকার সুদৃঢ় হয়েছে।

প্রস্তাবনায় 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু কি অর্থে 'গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করে বলা হয়নি। সংকীর্ণ ও ব্যাপক উভয় অর্থেই গণতন্ত্রকে প্রয়োগ করা যায়। সংকীর্ণ অর্থে গণতন্ত্র বলতে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্রকে বোঝায়। এ হল সরকার গঠন ও পরিচালনার বিশেষ ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সংবিধানের ৩২৬ ধারায় গৃহীত হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি, আইনের অনুশাসন এবং স্বাধীন বিচার-বিভাগের মাধ্যমে ভারতে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতে জনপ্রতিনিধিদের হাতেই শাসনক্ষমতা ন্যস্ত আছে।

গণতান্ত্রিক

কিন্তু আধুনিক গণতন্ত্রের অর্থ অধিকতর ব্যাপক। ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলতে রাষ্ট্রনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়াও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে বোঝায়। বলা হয় যে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়তে বাধ্য । অর্থনৈতিক সাম্য ছাড়া রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। অধ্যাপক ল্যাস্কি (H. Laski) বলেছেন : "Political equality is never real unless it is accompanied by virtual economic equality." বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *Nationalism* শীর্ষক রচনায় বলেছেন : "Democracy in the political sphere has really no meaning unless it is accompanied by democracy in the social, economic and the spiritual spheres. " তিনি আরও বলেছেন সামাজিক দাসত্বের চোরাবালির উপর রাজনৈতিক সৌধ নির্মাণ অলস কল্পনা বই কিছু নয় ("It is an idle hope to think of building a political miracle of freedom upon the quicksand of social slavery.")।

অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র অর্থহীন

এই কারণে ভারতের সংবিধানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করবার

হলে পরিপূর্ণভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

প্রস্তাবনায় গণতন্ত্রের সঙ্গে সাধারণতন্ত্র শব্দটিও ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণভাবে গণতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র সমার্থক বলে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু উভয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বর্তমান। গণতন্ত্রের মত সাধারণতন্ত্রেও জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা পরিচালিত সরকার থাকে। অধিকন্তু সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধানের পদ হয় নির্বাচনমূলক। এখানে বংশানুক্রমিক বা উত্তরাধিকারমূলক কোন রাজপদ থাকে না। রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের দ্বারা নির্দিষ্ট

সাধারণতন্ত্র

সময়ের জন্য নির্বাচিত হন। সাধারণতন্ত্রে জনগণের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা স্বীকার করা হয়। সংবিধান-বিশারদ কাশ্যপ (S. C. Kashyap)-এর অভিমত অনুযায়ী সাধারণতন্ত্র হল এক বিশেষ রাষ্ট্রব্যবস্থা। এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত থাকে। কোন সুবিধাভোগী শ্রেণী এখানে থাকে না। সকল নাগরিকের জন্য সকল সরকারী কর্মদপ্তর খোলা থাকে। এ ক্ষেত্রে সরকার কোন রকম বাছবিচার করে না। সাধারণতন্ত্রে কোন বংশানুক্রমিক শাসক থাকে না। এখানে জনগণ রাষ্ট্র- প্রধানকে নির্বাচিত করে। তাঁর কার্যকাল নির্দিষ্ট। রাষ্ট্রপ্রধানকে সাধারণত রাষ্ট্রপতি বলা হয়।

ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির পদ নির্বাচনমূলক। তিনি ৫ বছরের জন্য জনগণের দ্বারা অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। তা ছাড়া এখানে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা এখানে জনগণের হাতেই ন্যস্ত আছে। এখানে সকল রকম শ্রেণীগত সুযোগ-সুবিধা ও বৈষম্যকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। এইভাবে আদর্শগত অর্থেও ভারতে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। শ্রীদুর্গাদাস বসু (D. D. Basu) বলেছেন ঃ ‘‘The peamble to our constitution uses the term in both senses.’’

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, অ-সাধারণতান্ত্রিক গণতন্ত্রে (Non-Republican Democracy) রাষ্ট্রপ্রধানের পদ হল উত্তরাধিকারমূলক বা বংশানুক্রমিক। ইংল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাজা বা রানী। তাঁরা উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতাসীন হন। নিউজিল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন গভর্নর-জেনারেল। তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত করেন গ্রেট ব্রিটেনের রাজা বা রানী। অপর দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা হল সাধারণতান্ত্রিক। কারণ মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি নির্বাচিত হন।

ACE Scanner

ধরা হল।

৮.৩.১ সাম্যের অধিকার (Right to Equality)

গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য হল বৈষম্যের অবসান। এই রাজনৈতিক আদর্শ শিল্প বিপ্লবের গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনে প্রধান দাবি হিসাবে বিকশিত হয়। ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংক্রান্ত ঘোষণাপত্রেও উল্লেখিত হয়। বলা হল "সব মানুষকেই সমান ভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে" ("All men are created equal.")। এই লক্ষ্যসাধনে পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম

ঐতিহাসিক পটভূমি

ACE Scanner

আলোড়নকারী ঘটনা হল "ফরাসি বিপ্লব"। কারণ ফরাসি বিপ্লবের মূল দাবি ছিল "স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ব" ("Liberty, Equality, Fraternity")। এই বিপ্লবের পর সমগ্র দুনিয়ার গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের কাছে 'সাম্যের আদর্শ চোখের মণির মত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পরাধীন ভারতে নজরুল ইসলামের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় "গাহি সাম্যের গান—"। অবশ্য তার মানে এই নয় যে, ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে 'সাম্যের' দাবি ছিল না। আড়াই হাজার বছর আগে গ্রিক সভ্যতার স্বর্ণময় যুগে পেরিক্লিস তাঁর বিখ্যাত "অন্ত্যেষ্টি বক্তৃতায়" (Funeral speech) আইনের দিক থেকে সকল গ্রিক নাগরিক সমান একথা ঘোষণা করেন। আমাদের দেশে প্রিয়জন কর্তৃক মুখাগ্নি করা দেখে অনেকের যেমন 'শ্মশান বৈরাগ্য' দেখা দেয় বা বলে ওঠে "কা তব কান্তা কস্তে পুত্র সংসার অয়ম্ অতীব বিচিত্র।" যাই হোক, ১৯৪৮ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের "আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ঘোষণা"-তে (Universal Declaration of Human Rights) "সব মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন ও সমান" এ ধারণা মূর্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের ভারতীয় সংবিধানেরও ১৪ থেকে ১৮ নম্বর ধারায় এই সাম্যের অধিকার প্রথম ও প্রধান গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার হিসাবে ঘোষিত।

আইনের চোখে সমান এবং আইন দ্বারা সমভাবে রক্ষিত

১৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে "ভারত ভূখণ্ডে প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের চোখে সমান (Equal in the eye of law) এবং আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত (Equal protection of law) হবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।" অর্থাৎ ভারতে সব মানুষ আইনের দৃষ্টিতে সমান। ১৪ নম্বর ধারায় দু'টি মূল অংশ ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুসারে রচিত। ব্রিটেনে 'আইনের অনুশাসন' (Rule of law) তত্ত্ব অনুসারে ১৪ নম্বর ধারার প্রথমাংশ গঠিত অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যতই মর্যাদাসম্পন্ন হোন না কেন, আইনের দৃষ্টিতে তাঁর কোনো বিশেষ অবস্থান নেই। ডাইসির কথায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী থেকে বহুনিন্দিত পুলিশ সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান। অর্থাৎ সমান অপরাধ করলে সমান শাস্তি ভোগ করবেন। এই ধারার দ্বিতীয়াংশটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' (Due process of law) অনুসারে রচিত। অর্থাৎ "আইন সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে।" এই নীতি অনুসারে শুধুমাত্র শাসন-বিভাগ নয়, আইন বিভাগের স্বৈরাচার থেকেও ব্যক্তিকে অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব। ডি. বসু ও বিচারপতি সুব্বা রাও একই সুরে বলেন যে, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য হল একটি নেতিবাচক ধারণা (a negative concept) যার অর্থ হল আইনের দৃষ্টিতে কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা থাকবে না এবং সর্বশ্রেণির মানুষের উপর দেশের সাধারণ আইন সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। অন্যদিকে 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' তথা আইনের দ্বারা সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার একটি ইতিবাচক ধারণা (a positive one) যার অর্থ হল একই রকম পরিস্থিতিতে আইন হবে সকলের ক্ষেত্রে সমান।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান নয়। ভারতে 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' নীতির কতকগুলি ব্যতিক্রম সংবিধানেই স্বীকৃতি দিয়েছে এবং যে ব্যতিক্রমগুলি সবিশেষে উল্লেখযোগ্য তা হল:

যথা—**প্রথমত,** রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপাল স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তাঁদের কোনো আদালতে কৈফিয়ত দিতে হয় না।

দ্বিতীয়ত, তাঁদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যায় না।

তৃতীয়ত, স্বপদে থাকা কালে এঁদের গ্রেপ্তার করা যায় না অথবা এদের কারাবাসের জন্য আদালত কোনো নির্দেশ দিতে পারে না।

চতুর্থত, এমনকি স্বপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বা পরে সম্পাদিত ব্যক্তিগত কর্ম সম্পাদনের জন্য রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা দায়ের করতে হলে ২ মাস আগে নোটিশ দিতে হয়।

হয় না।

১৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ, স্ত্রী-পুরুষ, জন্মস্থান নির্বিশেষে সকল নাগরিকদের দোকন, রেস্তোরাঁ, হোটেল এবং প্রমোদস্থানে প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের পুরোপুরি বা আংশিক অর্থ সাহায্যে পরিচালিত কুয়ো, স্নানের ঘাট বা রাস্তা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও কোনো নাগরিককে বঞ্চিত করা যাবে না।

জাতি ধর্ম নির্বিশেষ সমানাধিকার

তবে এ অধিকারের দুটি ব্যতিক্রম আছে। যথা—প্রথমত, নারী ও শিশুদের জন্য রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তা বৈষম্যমূলক আচরণ বলে বিবেচিত হবে না। বাসে মহিলাদের আসন রক্ষার আইন এই কারণেই অসাম্যের দ্যোতক নয়। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ও সামাজিক দিক হতে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণও সাম্যের প্রতিবন্ধক নয়। বা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শুধু ছাত্রীদের জামাকাপড় দেওয়া একারণেই বিধিসম্মত।

ব্যতিক্রম

অবশ্য সংবিধানে ১৫ নম্বর ধারায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর মানুষদের সুযোগ-সুবিধা দানের ভিত্তিতে মাদ্রাজ সরকার সরকারি কলেজগুলিতে ভর্তি করার ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক আসন নিম্নবর্ণের হিন্দু ও অহিন্দুদের জন্য সংরক্ষণের নির্দেশ দেয়। সরকার প্রদত্ত এই নির্দেশের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা সুপ্রিমকোর্টে দায়ের হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৯৫১ সালের এস. চম্পাকম দোরাই রাজন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলা। সুপ্রিমকোর্টের রায়ে মাদ্রাজ রাজ্যের এই নির্দেশ বাতিল হয়ে যায়। কারণ সুপ্রিমকোর্টের মতে যোগ্যতা ও মানের ক্ষেত্রে কোনোরকম অসাম্য করা ১৫ নম্বর ধারার বিরোধী। যাই হোক, প্রথম সংবিধান সংশোধন করে ১৫ নম্বর ধারায় তপশিল জাতি ও উপজাতিদের জন্য বিশেষ সরকারি সুযোগ-সুবিধা দানকে আইসম্মত করে নেওয়া হয়। ১৫ নম্বর ধারার সঙ্গে ৪ নম্বর উপধারা সংযোজিত হয়। বলা হয় ''সমাজে ও শিক্ষায় অনগ্রসর শ্রেণির নাগরিকগণের উন্নতি সাধনের জন্য তা তপশিল জাতিসমূহের (S.C) ও তপশিল জনজাতিসমূহের (S.T.) জন্য রাজ্য কর্তৃত্ব কোনো বিশেষ বিধান প্রণয়নে এই ধারার কিংবা ২৯ ধারার (২) প্রকরণের কোনো কিছুই অন্তরায় হবে না।'' বস্তুত এর ফলে অনুন্নত ও তপশিল জাতি ও উপজাতিদের উন্নতিতে বিশেষ সরকারি সুযোগ দান ব্যবস্থা গ্রহণের পথ থেকে অন্তরায়সমূহ দূর হয়।

১৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে নাগরিকের সমানাধিকার থাকবে। রাষ্ট্র শুধুমাত্র ধর্ম, বর্ণ, জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, জন্মস্থান, বাসস্থান প্রভৃতির কোনো একটি কারণে চাকরি বা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য করবে না। দ্বিতীয়ত, সরকারি চাকরি বা পদে নিয়োগ ছাড়া বেতন, পদোন্নতি, ছুটি, পেনশন ইত্যাদি বিষয়েও সরকার কোনো বৈষম্য করতে পারবে না।

চাকরির ক্ষেত্রে সমানাধিকার

হয়েছে। ২০০৮ সালের বিশ্ব আর্থিক মন্দা চাকুরির বাজারকে আরও সংকুচিত করে ফেলেছে।

১৭ নম্বর ধারায় অস্পৃশ্যতাকে আইনগত দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অস্পৃশ্যতা প্রয়োগ করতে চাইলে ব্যক্তির কী শাস্তি হবে সে ব্যাপারে সংসদ একটি বিস্তৃত আইন রচনা করেছে। ১৯৫৫ সালে রচিত

অস্পৃশ্যতা

এ আইনের নাম অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) আইন (Untouchability (Offence) Act, 1955)। এই আইনে বলা হয়েছে 'অস্পৃশ্য বলে কোনো ব্যক্তির হাসপাতালে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অথবা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কোনো দেবালয়, দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ, প্রমোদস্থান (সিনেমা গৃহ, পার্ক ইত্যাদি) প্রভৃতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা অপরাধ বলে গণ্য করা হবে। সকলের জন্য উন্মুক্ত রাস্তাঘাট, কুয়ো, টিউব-ওয়েল, জলাধার, শ্মশান, গোরস্থান, কবরখানা ইত্যাদি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে 'অস্পৃশ্য' বলে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। এই অস্পৃশ্যতা অপরাধ আইন পরবর্তীকালে সংশোধিত হয়ে পৌর অধিকার সংরক্ষণ আইন (Protection of Civil Rights Act,) নামে পরিচিত লাভ করে।

অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের সাংবিধানিক ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া সত্ত্বেও আজও ভারতীয় সমাজে এ ব্যাধিকে দূর করা বাস্তবে সম্ভব হয়নি। বিহার, উত্তরপ্রদেশে এই কুসংস্কারের বহু নজির নিয়তই দেখা যায়।

সংবিধানের ১৮ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে সামরিক ও শিক্ষাগত উপাধি ছাড়া রাষ্ট্র অন্য কোনো উপাধি দিতে পারবে না এবং কোনো ভারতীয় নাগরিক কোনো বিদেশি উপাধি গ্রহণ করতেও পারবে না। কিন্তু

ACE Scanner

কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় সরকার স্বয়ং এই সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ১৯৫৪ সাল থেকে ভারতরত্ন, পদ্মভূষণ, পদ্মশ্রী প্রভৃতি উপাধি ক্রমাগত দান করে চলেছে। বিরোধীরা বলে এই সমস্ত উপাধি ব্রিটিশ আমলের নবাব, রাজা, মহারাজা প্রভৃতি উপাধির ন্যায় সামাজিক অসাম্যকে উৎসাহিত করে। অপরদিকে সরকার পক্ষ বলে এই উপাধি সম্মান বা পুরস্কার মাত্র এবং ১৯৬৮ সালে আইন করে বলা হয়েছে যে এগুলি নামের পাশে ব্যবহার করা চলবে না। বাস্তবে কিন্তু বহু উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এগুলি নামের পাশে ব্যবহার করে থাকেন। উপাধিগত বৈষম্য দূর করতে ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত জনতা সরকার এই সমস্ত উপাধি দান বন্ধ রাখে। কিন্তু পরবর্তী সরকার এই উপাধিদান চালু রেখেছে। সংবিধানে উপাধি দানের বা খেতাব প্রদানের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা সাম্য নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা এ নিয়ে মতপার্থক্য আছে। বহু সমালোচক বলেন এ ধরনের উপাধি দান সাম্য নীতির পরিপন্থী। কারণ (১) যাঁরা এই সব উপাধি লাভ করেন তাঁদের সামাজিক মর্যাদা অপরাপর নাগরিকদের থেকে বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। যেমন 'ভারতরত্ন' উপাধি প্রাপ্তদের পদমর্যাদা হল ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের ঠিক নীচে। (২) নিজেদের নামের সঙ্গে এই খেতাব ব্যবহার করা যাবে না বলা হলেও যাঁরা এই খেতাব নামের সঙ্গে ব্যবহার করবেন তাদের এই ব্যবহার 'অপরাধ' বলে কোথাও ঘোষিত হয়নি। বহু ব্যক্তিকে নামের সামনে সানন্দে 'ভারতরত্ন' ব্যবহার করতে দেখা যায়। (৩) বহু সময়ে শাসক গোষ্ঠী তাদের নিজ গোষ্ঠীর লোককে অথবা বহু অপদার্থ ও দাগি আসামিকে এ ধরনের খেতাব দিতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ এন. এস. জৈন (চক্ষু চিকিৎসক)-কে পদ্মশ্রী উপাধি দেওয়া হয় অথচ তিনি স্ত্রীকে হত্যা করার অপরাধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

উপাধিদান নিষিদ্ধ

অন্যদিকে বহু ভারত বিশেষজ্ঞ মনে করেন এই উপাধি প্রদান কোনোভাবেই সাম্য নীতির পরিপন্থী নয় বরং এই সম্মান দানের মধ্য দিয়ে নাগরিকদের বিশেষ গুণের প্রকৃত স্বীকৃতি মেলে।

দ্বিতীয় মতের সমর্থক কম। শিশির ভাদুড়ী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, জে. বি. কৃপালনী, চলপতি রাও, উৎপল দত্ত কর্তৃক এ ধরনের খেতাব প্রত্যাখ্যান প্রথম মতের বক্তব্যকে যথার্থ বলে স্বীকৃতি দেয়। খেতাব বণ্টন সম্পর্কে মধু লিমায়ে লোকসভায় যা বলেছিলেন তা সত্যই চাঞ্চল্যকর কারণ তাঁর মতে ছিল ''যে সব ব্যক্তি জনগণকে শোষণ করে বা কর ফাঁকি দেয় তাদেরই এই সব খেতাবে ভূষিত করা হয়।''

৮.৩.২ স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)

সাম্যের ন্যায় স্বাধীনতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আদর্শ। কারণ ল্যাস্কির ভাষায় স্বাধীনতা ব্যতীত মানুষ তার সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে না। প্রতিটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় এই অধিকারকে অন্যান্য অধিকারের প্রাণকেন্দ্র বলে চিহ্নিত করা হয়। সুতরাং ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হবার কালেই শুধু 'স্বাধীনতার' দাবি বিস্তৃতি লাভ করে তা নয়, এই বিপ্লবের পূর্বে ও পরে বহু দেশে মনীষীরা

ACE Scanner

স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে সংগ্রাম করে গেছেন। পরাধীন ভারতে কবি রঙ্গলাল বলেছেন :

স্বাধীনতা হীনতায়
কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়?

স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সাফল্যের মূল শর্ত। ভারতীয় সংবিধানে ১৯ থেকে ২১ নম্বর ধারায় নাগরিকদের স্বাধীনতা অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধান ও অভিজ্ঞতার আলোকে এই অধিকারকে পর্যালোচনা করা আবশ্যক। বস্তুত, ভারতের সংবিধান প্রণেতাগণ স্বাধীনতার অধিকার বলতে কোনো অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার তত্ত্বে বিশ্বাস করতেন না। কারণ অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতার অধিকার স্বেচ্ছাচারে পর্যবসিত হয় এবং সামাজিক ভারসাম্যকে বিনষ্ট করে। তেমনি প্রতিরোধহীন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব চরম স্বৈরাচারে পরিণত হয় সে অভিজ্ঞতা তাঁদের ছিল। তাই তাঁরা ব্যক্তির দাবি ও সামাজিক কল্যাণের মধ্যে ভারসাম্য আনয়নে প্রয়াসী হন। এই লক্ষ্যে সফলতা অর্জনের জন্য স্বাধীনতার অধিকারের উপর 'যুক্তিসংগত বাধানিষেধ' (reasonable restrictions) আরোপ নীতি সংযোজন করেন। কারণ এই নীতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচার ও রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচার প্রতিরোধ সম্ভবপর হয়। উদাহরণস্বরূপ আমার বাক্‌স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক তার অর্থ এই নয় যে আমি যা খুশি তাই বলব বা ইচ্ছামতো গালমন্দ করতে পারব।

স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচার নয়

ভারতীয় সংবিধানে ১৯ থেকে ২২ নম্বর ধারায় স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে বিশদ বক্তব্য মেলে। ১৯ নম্বর ধারায় বাক্‌স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, সমবেত হবার স্বাধীনতা সহ কয়েকটি অধিকার সংরক্ষিত হয়েছে। ২০ নম্বর ধারায় অপরাধের জন্য শাস্তির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ মেলে। ২১ নম্বর ধারায় জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করার কথা ঘোষিত হয়েছে এবং ২২ নম্বর ধারায় কয়েকটি ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার ও আটকের বিরুদ্ধে সংরক্ষণের অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। সুতরাং এই অধিকারগুলি কতটা ভারতে কার্যকর তা বিচার করা আবশ্যক।

সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারায় বর্ণিত ছ'টি অধিকারকে স্বাধীনতার অধিকারের মূল ভিত্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়। অবশ্য মূল সংবিধানে ১৯ নম্বর ধারায় সাত প্রকারের স্বাধীনতার অধিকার উল্লেখিত ছিল; কিন্তু ১৯৭৮ সালে ৪৪ তম সংবিধানে সংশোধন আইন দ্বারা 'সম্পত্তি অর্জন, দখল ও হস্তান্তরের' স্বাধীনতাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে যে ছয় প্রকারের স্বাধীনতা ১৯ নম্বর ধারায় স্বীকৃত তা হল :

ছ' প্রকারের স্বাধীনতার অধিকার

(ক) বাক্‌স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা (freedom of speech and expression);

(খ) শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হবার অধিকার (to assemble peaceably and without arms);

(গ) সমিতি বা সংঘ গঠনের অধিকার (to form associations or unions);

(ঘ) ভারত ভূখণ্ডে সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার (to move freely throughout the territory of India);

(ঙ) ভারত ভূখণ্ডের যে-কোনো অংশে বসবাস ও স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের অধিকার (to reside and settle in any part of the territory of India);

(চ) বাতিল;

(ছ) যে-কোনো বৃত্তি অবলম্বনের বা যে কোনো পেশা, ব্যবসা বা বাণিজ্য চালানোর অধিকার (to practise any profession, or to carry on any occupation, trade or business).

২৮ নম্বর ধারায় যে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে তা ...

ধর্মাচরণের স্বাধীনতা

সংবিধানের ২৫ নম্বর ধারা অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার বিবেক অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কোনো ধর্মমত গ্রহণ, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন এবং ধর্মমত প্রচার করতে পারে। সাধারণভাবে রাষ্ট্র কোনো ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তবে (১) জনশৃঙ্খলা, সমাজে স্বীকৃত নীতিবোধ, জনস্বাস্থ্য এবং অন্যান্য মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য ধর্মাচরণের উপর রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করতে পারে। (২) নরবলির মতো অমানবিক ধর্মীয় কার্যাবলি বা সতীদাহ, দেবদাসী প্রথার মতো নীতিবিগর্হিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে। (৩) তা ছাড়া, সামাজিক কল্যাণ ও সংস্কারসাধন অথবা হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে সকল শ্রেণির হিন্দুদের কাছে (শিখ, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মালম্বীরাও হিন্দু) উন্মুক্ত রাখার জন্যও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে বা আইন প্রণয়ন করতে পারে। পূর্বে হরিজনরা বহু হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ করতে পারত না। এখন এই ২৫ নম্বর ধারা অনুসারে হিন্দু মন্দিরে হিন্দুদের অবাধ প্রবেশের আইন রচিত হয়েছে। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে সর্বপ্রকার হিন্দুরা প্রবেশাধিকার লাভ করেছে। প্রসঙ্গত বলা যায় বিভিন্ন সময়ে আদালত বিভিন্ন রায়ের মধ্য দিয়ে জনশৃঙ্খলার স্বার্থে ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করার রাষ্ট্রীয় অধিকারকে স্বীকার করে নিয়েছে। যথা আনন্দমার্গী মামলায় (জগদ্বীশ্বরানন্দ বনাম পুলিশ কমিশনার, ১৯৮৪) বলা হয় “the right to perform ‘tandav’ dance with leathed weapons and human skulls in a public processions was held to be an essential religious practice and banning of the procession in the interest of public order and morality was considered a reasonable restriction.”

ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অধিকার

২৬ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে প্রতিটি ধর্মীয় সম্প্রদায় বা তার কোনো অংশ (১) ধর্ম ও দানের উদ্দেশ্যে সংস্থা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে; (২) ধর্মীয় বিষয়ে নিজ নিজ কার্যাবলী পরিচালনা করতে পারবে এবং (৩) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন, দখল ও আইন অনুসারে সেই সম্পত্তি পরিচালনা করতে পারবে। এই অধিকারও অবাধ নয়। রাষ্ট্র জনশৃঙ্খলা, নৈতিকতা এবং জনস্বাস্থ্যের কারণে এই ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। উগ্রপন্থীদের দ্বারা ধর্মীয় স্থানের অপব্যবহারকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে চিহ্নিত করা হয়।

সংবিধানের ২৭ নম্বর ধারায় বলা আছে যে, কোনো বিশেষ ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনো ব্যক্তিকে কর প্রদানে বাধ্য করা যায় না অর্থাৎ চাঁদা প্রদান বাধ্যতামূলক হতে পারে না। কিন্তু মন্দির দর্শন, পূজার্চনা ইত্যাদি ব্যাপারে রাষ্ট্র কর ধার্য করার পরিবর্তে ফি (fee) ধার্য করে সংবিধানের এই বাধাটিকে অতিক্রম করতে পারে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধর্মশিক্ষা

সবশেষে ২৮ নম্বর ধারাতে উল্লেখিত হয়েছে যে সম্পূর্ণভাবে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মবিষয়ক শিক্ষা দান করা যায় না এবং বলা আছে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার কর্তৃক স্বীকৃত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষার্থীদের অনুমতি ছাড়া ধর্মশিক্ষা দেওয়া যাবে না। যেখানে শিক্ষার্থীরা অপ্রাপ্তবয়স্ক সেখানে অভিভাবকদের অনুমতি আবশ্যক।

উপসংহারে বলা যায় ভারতে স্বীকৃত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। পাকিস্তান বা বাংলাদেশের ন্যায় ভারত ধর্মীয় রাষ্ট্র নয়। ভারতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব বাতিল করা হয়েছে। সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য সমান অধিকার স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাস্তবতা

কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ কেবল সাংবিধানিক ঘোষণার উপরেই নির্ভর করে না। ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে বাস্তবায়িত করতে হলে প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অপর সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, সহনশীলতা, প্রীতি ও সদ্ভাব থাকা আবশ্যক। দুঃখের কথা ভারতে এমত অবস্থার অভাব রয়েছে। প্রতি বছর বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা ঘটছে। তদুপরি সরকারের নানান কার্যকলাপ ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের মনে সন্দেহ উদ্রেক করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় জোর জুলুম করে চাঁদা আদায় রোধে ব্যর্থতা, সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে সরস্বতী পূজার ব্যবস্থা, সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত মিশন ও মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষাদান এবং সর্বোপরি হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য ভিন্ন আইন ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে সুদৃঢ় করে না। ১৯৮৬ সালের মুসলিম মহিলা আইন (তালাকপ্রাপ্তদের অধিকার) দ্বারা হিন্দু ও মুসলিম মহিলাদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের প্রতি আঘাতের অনবদ্য দৃষ্টান্ত। এসব কথা সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই স্বীকার করবে। ৬ ডিসেম্বর '৯২ বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়ায় ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সারা পৃথিবীতে সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু তার পরেও ধর্মান্ধতা ভারতে সম্পূর্ণভাবে রোধ করা যায়নি। ২০০২ সালে আমেদাবাদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আমাদের লজ্জিত করে। মহাশ্বেতা দেবীকে আজও রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে এ কারণে খোলা চিঠি লিখতে হয়।

... আদর্শ রূপায়িত করতে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের সার্বিক সহযোগিতা

৮.৩.৬ সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার (Right to Constitutional Remedies)

সাংবিধানিক প্রতিবিধান কী

সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলি ঘোষণাই যথেষ্ট নয় বরং ঘোষিত অধিকারগুলি কীভাবে বাস্তবায়িত হবে বা কিভাবে প্রয়োগ করা যাবে সেটাই আসল কথা। এছাড়া, আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ প্রায়শই নাগরিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত হয়। তাদের এই অপপ্রয়াস থেকে কিভাবে নাগরিক অধিকারগুলি সুরক্ষিত হবে তার উল্লেখও সংবিধানে থাকা কাম্য। এই সমস্ত কথাই মনে রেখে ভারতীয় সংবিধানের ৩২ ও ২২৬ নম্বর ধারায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলিকে সুনিশ্চিত করতে সংবিধানে প্রতিবিধানের অধিকার ঘোষিত

ACE Scanner

হয়েছে। ভারত সংবিধানের অন্যতম রূপকার ড. আম্বেদকর ৩২ নম্বর ধারাকে "সাংবিধানের আত্মা ও প্রাণকেন্দ্র" ("the very soul of the constitution and the very heart of it".) বলে আখ্যায়িত করেছেন। আম্বেদকর গণপরিষদে বলেন "আমাকে যদি সংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি ধারার নাম করতে বলা হয় তথা যে ধারাটি বাদ দিলে এই সংবিধান অর্থহীন হয়ে পড়ে তাহলে আমি এই ৩২ নম্বর ধারার কথাই বলব।" এম. ভি. পাইলির কণ্ঠে অনুরূপ বক্তব্য ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর মতে, "A declaration of fundamental rights is meaningless unless there is an effective machinery for the enforcement of the rights." রমেশ থাপ্পার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় আদালত বলে "Article 32 provides a guaranteed remedy for the enforcement of the rights conferred by Part III (of the Constitution) and this remedial rights is itself made a fundamental right by being included in Part III."

৩২ নম্বর ধারাকে চারটি অংশে ভাগ করে আমরা আলোচনাকে সংহত করতে পারি। এই ধারার প্রথমাংশে সাংবিধানিক প্রতিবিধান তথা মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষাকল্পে ভারতীয় নাগরিকবৃন্দ সুপ্রিমকোর্টের সহায়তা নিতে পারে বলে ঘোষিত হয়েছে। দ্বিতীয়াংশই মূল। এ অংশে বলা হয়েছে সুপ্রিমকোর্ট পাঁচ ধরনের লেখ (Writ) জারি করে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষা করতে পারে। এই পাঁচ ধরনের লেখ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হল।

বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ

১. **বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas corpus)** : এ শব্দটি আক্ষরিক অর্থ হল 'বন্দিকে আদালতে যথারীতি হাজির করা' অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হলে তার কারণ দর্শানোর জন্য সুপ্রিমকোর্ট বন্দির আবেদনক্রমে রাষ্ট্রে বিরুদ্ধে এই 'বন্দি-প্রত্যক্ষীকরণ' লেখটি জারি করে বন্দিকে আদালতে উপস্থিত করার জন্য নির্দেশ দিতে পারে এবং যদি দেখে এই গ্রেপ্তারি বেআইনি তাহলে তার মুক্তিদানের নির্দেশ দিতে পারে। সুপ্রিমকোর্ট কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই লেখ জারি করতে পারে না।

পরমাদেশ

২. **পরমাদেশ (Mandamus)** : এই শব্দটির অর্থ হল 'আমরা আদেশ' দিচ্ছি। সুপ্রিমকোর্ট এই 'পরমাদেশ' লেখ জারি করে অধস্তন আদালত, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তার দায়িত্ব পালন করার জন্য নির্দেশ জারি করতে পারে। অবশ্য রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এই লেখ জারি করা যায় না।

প্রতিষেধ

৩. **প্রতিষেধ (Prohibition)** : এর অর্থ হল 'নিষেধ করা।' এই নিষেধ করা লেখ 'প্রতিষেধ' ও 'পরমাদেশের' মধ্যে ফারাক আছে। কারণ পরমাদেশ কার্য সম্পাদনের কথা বলে, অপরদিকে 'প্রতিষেধ' লেখ কার্য সম্পাদনে বাধা দেয়; দ্বিতীয়ত, পরমাদেশের ব্যাপ্তি অপেক্ষা প্রতিষেধের ব্যাপ্তি সীমিত। কারণ এই লেখ কেবলমাত্র আদালতের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য হয়।

অধিকার পৃচ্ছা

৪. **অধিকার পৃচ্ছা (Quowarranto)** : বলতে আক্ষরিকভাবে বোঝায় 'কোন্ অধিকারে' অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যে সরকারি পদে অধিষ্ঠিত সেই 'পদে' থাকার তার যোগ্যতা আছে কিনা সে বৈধতা এই 'অধিকার পৃচ্ছা' লেখের মধ্য দিয়ে সুপ্রিমকোর্ট বিচার করতে পারে। পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির দাবি অবৈধ হলে সুপ্রিমকোর্ট সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পদচ্যুত করতে পারে।

উৎপ্রেষণ

৫. **উৎপ্রেষণ (Ceritiorari)** : এই লেখটিও গুরুত্বপূর্ণ। উৎপ্রেষণের অর্থ হল 'বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া।' নিম্নতম কোনো আদালত যদি নিজ এক্তিয়ারের বাইরে যায় তাহলে এই 'উৎপ্রেষণ' লেখের সাহায্যে মামলাকে উর্ধ্বতন আদালতে স্থানান্তরিত করা যায় এবং এক্তিয়ার বহির্ভূত সিদ্ধান্তকে বাতিল করা যায়।

PDF Scanner ACE Scanner

অধিকারের সঙ্গে কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। অধিকাংশ সংবিধানে নাগরিকদের অধিকারসমূহ বিধিবদ্ধ থাকলেও কর্তব্য অনুচ্চারিত থেকে যেতে দেখা যায়। ভারতের মূল সংবিধানেও শুধু অধিকারগুলি ১২ থেকে ৩৫ নম্বর ধারায় লিপিবদ্ধ ছিল; কর্তব্য উল্লেখিত ছিল না। ১৯৫০ থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৬ বছর ভারতীয় সংবিধানে কোনো কর্তব্য যুক্ত ছিল না।

৪২ তম সংবিধান সংশোধন করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি ভারতের নাগরিকদের দশটি কর্তব্য সংযোজন করেন। সম্প্রতি আরও ১টি কর্তব্য যুক্ত হওয়ায় মোট কর্তব্যের সংখ্যা হয়েছে ১১টি। অবশ্য এই কর্তব্যগুলি মৌলিক অধিকারের তৃতীয় অধ্যায়ে সংযোজিত হবার বদলে সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে তথা রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতির ৫১(ক) ধারা হিসাবে সংযোজিত হয়েছে। তদনুসারে কর্তব্যগুলি হল :

(১) সংবিধান মান্য করা, সংবিধানের আদর্শ, জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা ;

(২) যে সব মহান আদর্শ জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল সেগুলিকে সযত্নে সংরক্ষণ ও অনুসরণ করা ;

(৩) ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করা ;

(৪) দেশ রক্ষা করা ও আহ্বান জানালে জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা ;

(৫) ধর্ম, ভাষা, আঞ্চলিক ও শ্রেণিগত ভিন্নতার ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশসাধন করা এবং নারীর মর্যাদাহানিকর প্রথাসমূহ বর্জন করা ;

(৬) আমাদের মিশ্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করা ;

(৭) বনভূমি, হ্রদ, নদনদী ও বন্যপ্রাণীসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন করা এবং জীবন্ত প্রাণীদের প্রতি মমত্ববোধ পোষণ করা ;

(৮) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতা, অনুসন্ধিৎসা এবং সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার সাধন করা ;

(৯) জনসাধারণের সম্পত্তি রক্ষা এবং হিংসা বর্জন করা ;

PDF Scanner ACE Scanner

(১০) যাতে সর্বপ্রকারের ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা উন্নততর পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে সেজন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপের উৎকর্ষ বিধানের জন্য সচেষ্টা হওয়া ;

(১১) পিতা-মাতা অথবা অভিভাবকের দায়িত্ব হল ৬-১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষায় সুযোগ সুনিশ্চিত করা।

জে. সি. জোহারী মৌলিক কর্তব্যগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। এগুলি হল : (১) নৈতিক কর্তব্য (Duties as Moral Precepts), (২) রাজনৈতিক কর্তব্য (Duties as Political in nature) এবং (৩) বিশেষ ভাবে আরোপিত কর্তব্য (Duties as Specifically Enforceable)। জোহারীর মডেল অনুসারে কর্তব্যগুলি নিম্নরূপে বিভাজ্য :

মৌলিক কর্তব্য

নৈতিক কর্তব্য	রাজনৈতিক কর্তব্য	বিশেষভাবে আরোপিত কর্তব্য
(১) স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান আদর্শ সংরক্ষণ	(১) সংবিধান, জাতীয় পতাকা এবং জাতীয় সঙ্গীতকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন	(১) প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা এবং
(২) আমাদের মিশ্র সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে রক্ষা করা	(২) দেশের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতিকে সংরক্ষণ করা,	(২) জনগণের সম্পত্তি রক্ষা এবং হিংসা বর্জন করা।
(৩) বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, মানবিকতা এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারমুখী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার সাধন এবং	(৩) দেশ রক্ষা ও জাতীয় সেবায় আত্মনিয়োগ করা এবং	
(৪) ব্যক্তিগত ও যৌথ কর্ম প্রচেষ্টার উন্নতিসাধন।	(৪) সকল ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ সাধন করা।	
(৫) শিশুর শিক্ষা (৬-১৪) সুনিশ্চিত করা।		

যাই হোক, ভারতের সংবিধানে বর্ণিত কর্তব্যগুলির কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সহজাত দুর্বলতা আছে।

১৪.৩.১ লোকসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Powers and Functions of Lok Sabha)

ব্রিটেনের ন্যায় ভারতে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা রূপায়ণের অঙ্গীকার ভারত সংবিধানে ঘোষিত হয়। ভারতের সংসদও দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। উচ্চকক্ষ **রাজ্যসভা** ও নিম্নকক্ষ **লোকসভা**। ভারতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় উচ্চকক্ষকে শক্তিশালী করা হয়নি—ফলে ভারতের নিম্নকক্ষ তথা লোকসভাই হল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। তাই অনেকে ভারতের পার্লামেন্টের ক্ষমতা বলতে সাধারণভাবে লোকসভার ক্ষমতাকেই বুঝে থাকেন, যদিও তা সত্য নয়। তবে লোকসভা ভারতীয় রাজনীতিতে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী একথা কেউই অস্বীকার করে না। সুতরাং লোকসভার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতাগুলি একে একে আলোচিত হল :

ভারতে ব্রিটেনের ন্যায় নিম্নকক্ষের ক্ষমতা

প্রথমত, আইন প্রণয়ন করা হল লোকসভার প্রধান কাজ। সংবিধান অনুসারে ভারতে আইন প্রণয়নের তিনটি ক্ষেত্র আছে যথা—কেন্দ্রীয় তালিকা, যুগ্ম তালিকা ও রাজ্য তালিকা। মূল সংবিধানে কেন্দ্রীয় তালিকায় ৯৭টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। সংবিধান সংশোধন হওয়ায় এই তালিকা আরও স্ফীত হয়েছে। এই তালিকায় প্রতিরক্ষা, মুদ্রা ব্যবস্থা, আমদানি, রপ্তানি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত। লোকসভা এই সমস্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার অন্যতম প্রধান অধিকারী। রাজ্যসভার সাহায্যে এ সমস্ত বিষয়ে লোকসভা আইন প্রণয়ন করতে সক্ষম। অনুরূপ যুগ্ম তালিকায় ৪৭টি বিষয় ছিল। বর্তমানে এর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েই যুগ্ম তালিকায় আইন প্রণয়ন করতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করলে ঐ বিষয়ে রাজ্য সরকার আইন প্রণয়ন করতে পারে না বা করলে তা বাতিল হয়ে যায়। যুগ্ম তালিকায় শিক্ষা, বিমা, বিবাহ চুক্তি ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আইন প্রণয়নে কেন্দ্রীয় আইনসভা তথা লোকসভা ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী।

লোকসভার আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা

ভারতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তত্ত্বগত ভাবে রাজ্যসভা ও লোকসভা সমান ক্ষমতার অধিকারী। যে-কোনো কক্ষে বিল উত্থাপিত হতে পারে এবং এক কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে অপর কক্ষে অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়। সেই কক্ষ অনুমোদন না করলে বিলটি আইনে সাধারণভাবে পরিণত হতে পারে না। সুতরাং কোনো কক্ষ ইচ্ছা করলে বিলে অসম্মতি জানিয়ে আইন রচনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখলে দেখা যাবে যে বিলে বাধা দেবার প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করে লোকসভা। কারণ কোনো বিলকে কেন্দ্র করে সংসদে বিতর্ক বা অচলাবস্থা

যৌথ অধিবেশন

দেখা দিলে রাজ্যসভা ও লোকসভার **যৌথ অধিবেশন** আহ্বান করা হয় এবং বাধা যদি রাজ্যসভা থেকে আসে তা হলে লোকসভা তা অতিক্রম করতে পারে কারণ যৌথ অধিবেশনে লোকসভার সদস্য সংখ্যা রাজ্যসভা অপেক্ষা দ্বিগুণ। ফলে সহজেই লোকসভা অনুমোদিত বিল আইনে পর্যবসিত হয়। একারণেই বলা হয় লোকসভাই হল আইন প্রণয়নের প্রকৃত অধিকারী।

এছাড়া, বর্তমানে শাসন বিভাগ স্বয়ং কিছু আইন প্রণয়ন করে যা **"অর্পিত ক্ষমতা প্রসূত আইন"** (Delegated legislation) নামে পরিচিত। এই আইন যাতে যথাযথভাবে রচিত হয় তার জন্য লোকসভাই দৃষ্টি দিয়ে থাকে। কারণ **অধস্তন আইন সংক্রান্ত কমিটি** (Committee on Subordinate Legislation)-এর মাধ্যমে লোকসভা অর্পিত ক্ষমতা প্রসূত আইনকে তত্ত্বাবধান করে। এই কমিটিতে ১৫ জন সদস্য থাকেন এবং তাঁরা সকলেই লোকসভার সদস্য—রাজ্যসভার সদস্য নন।

অর্পিত ক্ষমতা প্রসূত আইন

দ্বিতীয়ত, অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে লোকসভাই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। একমাত্র লোকসভায় অর্থ বিল উত্থাপিত হতে পারে। লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত অর্থ বিল রাজ্যসভায় অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়; রাজ্যসভা ১৪ দিনের মধ্যে অর্থ বিলকে অনুমোদন না করলে ধরে নেওয়া হয় যে লোকসভা প্রেরিত অর্থ বিলটি উভয়কক্ষে অনুমোদিত হয়ে গেছে। এছাড়া, কোনো বিলটি অর্থ বিল কিনা তা স্থির করে দেয় লোকসভার স্পিকার। সুতরাং অর্থ বিল পাসের ক্ষেত্রে লোকসভা চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী এবং এ কারণেই বলা হয় **রাষ্ট্রপতি অর্থ দাবি করেন, লোকসভা তা মঞ্জুর করে এবং রাজ্যসভা তাতে সম্মতি দিয়ে থাকে।**

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা

তৃতীয়ত, লোকসভা ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী। কারণ রাষ্ট্রপতি যাঁদের মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন তাঁরা প্রত্যেকে এককভাবে ও যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়ী। মন্ত্রীসভা যতদিন লোকসভার আস্থাভাজন থাকে ততদিন পর্যন্ত তাঁরা স্বপদে টিকে থাকতে পারেন। লোকসভাই একমাত্র অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে এবং লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। অপরদিকে রাজ্যসভায় মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে কোনো অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয় না। ১৯৯০ সালে ভি. পি. সিং ও তাঁর মন্ত্রীসভা আস্থাভোটে পরাজিত হওয়ায় পদত্যাগ করেন। এছাড়াও লোকসভা শাসন বিভাগকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে যথা—

লোকসভার কাছে দায়বদ্ধতা

(১) প্রশ্নজিজ্ঞাসা, মুলতুবি প্রস্তাব, নিন্দাসূচক প্রস্তাব ও দৃষ্টি অকর্ষণী প্রস্তাবের মাধ্যমে লোকসভা মন্ত্রীসভাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(২) সরকারি নীতি ও কার্যপদ্ধতির সমালোচনা ও বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে মন্ত্রীসভাকে তথা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(৩) বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমেও লোকসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ সরকারি প্রতিশ্রুতি কমিটির মাধ্যমে লোকসভা মন্ত্রীরা যথাযথভাবে প্রতিশ্রুতি পালন করছে কিনা তা অনুসন্ধান করে দেখে।

(৪) বিভিন্ন সংস্থার প্রতিবেদনের উপর বিতর্কের মাধ্যমেও লোকসভা শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

বিচার বিষয়ক ক্ষমতা

চতুর্থত, ভারতে লোকসভার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিচার বিষয়ক ক্ষমতা আছে। রাজ্যসভার মতোই লোকসভা অধিকার ভঙ্গ বা কেন্দ্রীয় আইনসভার অবমাননা করলে কোনো অভিযুক্ত সদস্য বা ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে একদা ব্লিৎস (Bliz) পত্রিকার সম্পাদক আর.

PDF Scanner ACE Scanner

কে. করঞ্জিয়াকে লোকসভার অবমাননা করায় ক্ষমা চাইতে বাধ্য করা হয়। এছাড়া, রাজ্যসভার সঙ্গে একযোগে কোনো আদালতকে হাইকোর্টে উন্নীত করতে, কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে হাইকোর্ট স্থাপন এবং তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে।

পঞ্চমত, ভারতের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিতে লোকসভা ও রাজ্যসভা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বিশেষত লোকসভার ভূমিকা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে আজ পর্যন্ত যে ৯৪টি সংবিধান সংশোধন সমাধা হয়েছে—সেই সংক্রান্ত প্রায় সব বিলই লোকসভায় প্রথমে উত্থাপিত হয়েছে। ৩৬৮ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ও কার্যকাল, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ও হাইকোর্টের এক্তিয়ার সংক্রান্ত বিষয়, সুপ্রিমকোর্ট সংক্রান্ত বিষয়, সংবিধান সংশোধন প্রভৃতি ৫টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন করতে পার্লামেন্ট ছাড়া অঙ্গরাজ্যগুলির অনুমোদন আবশ্যক হয়। এই বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া বাকি সব বিষয়ে সংবিধান সংশোধনের অধিকারী হল মিলিতভাবে লোকসভা ও রাজ্যসভা। তবে সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিল লোকসভায় পাস হবার পর রাজ্যসভা তাতে অনুমোদন না দিলে সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিলটি খারিজ হয়ে যায়। রাজন্যভাতা বিলোপ বিল রাজ্যসভা অনুমোদন না দেওয়ায় প্রথমে সংবিধান সংশোধন সম্ভবপর হয়নি অথবা রাজীব গান্ধির আমলে লোকসভার 'পঞ্চায়েত ও নগর পালিকা' সংক্রান্ত সংবিধান সংশোধনী প্রয়াস রাজ্যসভা অকার্যকর করে দেয়।

সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত ক্ষমতা

ষষ্ঠত, লোকসভা নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয়েও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে লোকসভা ও রাজ্যসভা মিলিতভাবে অংশ নেয়। স্পিকারকে নির্বাচিত করে লোকসভা। নির্বাচক সংস্থার সদস্য হিসাবে লোকসভার সদস্যরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাজ্যসভার সদস্যদের সমান মূল্যের ভোটদানের অধিকারী। বর্তমানে লোকসভার একজন সদস্যের ভোটমূল্য হল ৭০৮।

নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা

সপ্তমত, লোকসভা উচ্চপদস্থ পদাধিকারীদের পদচ্যুত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। উদাহরণস্বরূপ রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান অবমাননার অভিযোগ এলে তাঁকে পদচ্যুত করার ক্ষেত্রে লোকসভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এছাড়া, সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি, হাইকোর্ট সমূহের বিচারপতি, সর্বোচ্চ ব্যয় নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব পরীক্ষক, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যকের চেয়ারম্যান প্রমুখদের পদচ্যুত করার জন লোকসভা প্রস্তাব নিতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে লোকসভাকে রাজ্যসভার সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করতে হয়। কারণ লোকসভায় গৃহীত প্রস্তাব রাজ্যসভা অনুমোদন না করলে তা খারিজ হয়ে যায়। বস্তুত, পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের মোট সদস্যের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সমস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ কর্তৃক প্রস্তাব গৃহীত হবার পরই রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট পদাধিকারীকে পদচ্যুত করতে পারেন।

পদচ্যুতি সংক্রান্ত ক্ষমতা

অষ্টমত, লোকসভা রাষ্ট্রপতির জরুরি ক্ষমতা অনুমোদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে তিন ধরনের জরুরি অবস্থা—যথা জাতীয় জরুরি অবস্থা (৩৫২ ধারা), রাজ্য জরুরি অবস্থা (৩৫৬ ধারা) ও আর্থিক জরুরি অবস্থা (৩৬০ ধারা)—ঘোষণার অধিকার দেওয়া আছে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরি অবস্থা অবশ্যই সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে নতুবা তা নির্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে আপনা হতেই অকার্যকর হয়ে যাবে। জরুরি অবস্থা অনুমোদনে লোকসভা ও রাজ্যসভা সমান ক্ষমতা ভোগ করে।

জরুরি অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত ক্ষমতা

উল্লেখ্য যে ৪৪ তম সংবিধান সংশোধন করে ১৯৭৮ সাল থেকে স্থির হয়েছে যে এককভাবে

ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করে তা সংক্ষেপে উল্লেখিত হল।

(ক) **আনুমানিক ব্যয়-হিসাবে কমিটি** : সরকার তথা পার্লামেন্টের সদস্যরা ব্যয়ের প্রস্তাব করে। এই প্রস্তাবিত ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব বিচার-বিবেচনা করে ব্যয় সংক্ষেপ করার জন্য একটি কমিটি থাকা প্রয়োজন এটা সকলেই স্বীকার করেন। ফলে ভারতে আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি গঠিত হয়েছে। ব্রিটেনেও এ ধরনের কমিটি (Estimate Committee) রয়েছে।

ভারতে আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি ৩০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। লোকসভার সদস্যরা সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করেন। কোনো মন্ত্রী এই কমিটির সদস্য হতে পারেন না। এই কমিটি ব্যয়বরাদ্দের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে এবং এর মূল কাজ হল আনুমানিক ব্যয় হিসাব করা। লোকসভায় বাজেট পেশ করার সাথে সাথে এ কমিটির কাজ শুরু হয় এবং বাজেট পাস হওয়ার সাথে সাথে এই কমিটির মূল দায়িত্ব শেষ। এই কমিটি সরকারকে শুধু পরামর্শ দান ও সুপারিশ করতে পারে। ফলে এ কমিটির সুপারিশ বাধ্যতামূলক নয়।

তবে আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তখন সরকার এই কমিটির সুপারিশ মতো মিতব্যয়ী হওয়ার চেষ্টা করে থাকে।

(খ) **সরকারি গাণিতিক কমিটি** : সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারি গাণিতিক কমিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এই কমিটির মূল কাজ হল সরকারের যাবতীয় ব্যয় ও আর্থিক লেনদেন যথাযথ হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা।

ভারতে সরকারি গাণিতিক কমিটি ২২ জন সদস্য নিয়ে গঠিত যার মধ্যে ১৫ জন লোকসভা ও ৭ জন রাজ্যসভা হতে সমানুপাতিক দলীয় প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। কোনো মন্ত্রী এ কমিটির সদস্য হতে পারেন না। সাধারণভাবে বিরোধী দলের কোনো সদস্যকে এই কমিটির সভাপতি হিসাবে স্পিকার নিযুক্ত করেন।

সরকারি গাণিতিক কমিটির কাজ হল (১) যে উদ্দেশ্যে ও যে খাতে ব্যয় হয়েছে তা পার্লামেন্ট অনুমোদন করেছে কি না, (২) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা ব্যয় সংগঠিত হয়েছে কি না এবং (৩) যোগ্য কর্তৃপক্ষের রচিত নিয়মানুসারে ব্যয় করা হয়েছে কি না। যদি সরকার কর্তৃক কোনো অ-অনুমোদিত ব্যয় হয় তা হলে তার বিচার করে লোকসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফলে সরকার সংযত থাকতে বাধ্য হয়।

(গ) **মহানিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক** : ভারতীয় পার্লামেন্ট প্রত্যক্ষভাবে মহানিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা

PDF Scanner ACE Scanner

১১.৫ ভারতের প্রধানমন্ত্রী (The Prime Minister of India)

ভারতে ব্রিটিশ মডেলে শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গণপরিষদে গৃহীত হয়। ফলে ভারতে মন্ত্রীপরিষদচালিত শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়। পৃথিবীর অন্যান্য মন্ত্রীপরিষদচালিত সরকারের মতো ভারতেও প্রধানমন্ত্রী শাসনক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। তিনিই হলেন বেজহটের (Bagehot) ভাষায়, "ক্যাবিনেট সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর" (Keystone of the Cabinet arch)। তাঁকে কেন্দ্র করেই কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যাবলি বাস্তবায়িত হয়। ধীরে ধীরে গত পাঁচ দশক ধরে প্রধানমন্ত্রীর হস্তে যেভাবে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে তাতে ভারত সরকারকে "প্রধানমন্ত্রীশাসিত সরকার" (Prime Ministerial Form of Government) বললে কোনো অত্যুক্তি হয় না।

রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু প্রধানমন্ত্রী

সুতরাং, ভারত সংবিধানে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে বিশদ বক্তব্য না-থাকলেও বাস্তবতার আলোকে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদাকে বিশ্লেষণ করতে হয়।

প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ : সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলা নেই। শুধু ৭৫ নম্বর ধারায় বলা আছে "প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন..." ("The Prime Minister shall be appointed by the President...".) এবং ৭৫(৩) নম্বর ধারায় বলা আছে "মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়ী থাকবে" ("The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.")। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগে রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ নেই বললেই চলে। বস্তুত, সাধারণ নির্বাচনের পর যে দল লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। শুধুমাত্র যখন কোনো দল এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে না তখন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে রাষ্ট্রপতির কিছু ভূমিকা থাকে। গত পাঁচ দশকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনে মাত্র দু'তিনবার সমস্যা দেখা যায়; অন্য সময়ে প্রধানমন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক নির্বাচিত হতে দেখা যায়।

প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ

১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস দলের নেতারাই প্রধানমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেন। তবে ১৯৭৭ সালে কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না-পারায় তৎকালীন জনতা দল অন্যান্য দলের সহযোগিতায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। রাষ্ট্রপতি মোরারজি দেশাইকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন। কিন্তু ১৯৭৯ সালে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই পদত্যাগ করলে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দাবিদার জগজীবন রাম ও চৌধুরি চরণ সিং-এর মধ্যে চরণ সিংকে তদারকি সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন।

১৯৯১ সালে কোনো দল বা মোর্চা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না-পারায় রাষ্ট্রপতি নরসিমা রাওকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথবাক্য পাঠ করান। একাদশ সাধারণ নির্বাচনের পর কোনো দলই নিরঙ্কুশ

PDF Scanner ACE Scanner

সংখ্যাগরিষ্ঠতা না-পাওয়ায় রাষ্ট্রপতি একক বৃহত্তম দল বি. জে. পি. জোটের অটলবিহারী বাজপেয়ীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাবে ১৩ দিনের মাথায় তিনি পদত্যাগ করলে রাষ্ট্রপতি ১৯৯৬ সালে দেবেগৌড়াকে প্রধানমন্ত্রী করেন। কংগ্রেস ১৯৯৭ সালে দেবেগৌড়াকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়, ফলে ১৯৯৭ সালে আই. কে. গুজরাল প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৯৮ সালে দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনেও ত্রিশঙ্কু লোকসভা থাকায় রাষ্ট্রপতি বি. জে. পি. জোটের নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। ১৩ মাসের মাথায় ১ ভোটের ব্যবধানে অটলবিহারী সরকার ধরাশায়ী হয়। ১৯৯৯ সালে ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনেও কোনো জোট একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি—রাষ্ট্রপতি সম্ভাব্য সমস্ত বৃহৎ দলগুলিকে মন্ত্রীসভা গঠনে আহ্বান জানান। সকলে অক্ষমতা জানালে রাষ্ট্রপতি সংখ্যালঘু এন. ডি. এ. জোটের নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ করেন। তিনি তেলেগু দেশম পার্টির সমর্থন নিয়ে (২০০২) এন. ডি. এ. জোটের নেতা হিসাবে ক্ষমতাসীন ছিলেন। ২০০৯ সালে মনমোহন সিং-এর ইউ. পি. এ. সরকারও জোট সরকার।

কার্যকাল : সাধারণভাবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালে মেয়াদ পাঁচ বছর। তবে লোকসভা আগে ভেঙে গেলে বা জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে লোকসভার মেয়াদ বৃদ্ধি পেলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যকালে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। সংবিধানে বলা আছে, মন্ত্রীপরিষদ যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়ী। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী কার্যকালের মেয়াদ লোকসভার আয়ুষ্কালের সমান। ভারতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি সবচেয়ে দীর্ঘদিন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতাসীন ছিলেন। তিনি দু'দফায় মোট ১৫ বছর ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

কার্যকাল

বেতন ও ভাতা : ভারতের মূল সংবিধানের দ্বিতীয় তপশিলে বর্ণিত হারে প্রধানমন্ত্রী বেতন ও ভাতা পাবেন বলে স্থির হয়। তবে এও বলা হয় যে, এই হার ততদিন বলবৎ থাকবে যতদিন না সংসদ আইন প্রণয়ন করে নতুন বেতন হার নির্ধারণ করে। প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের থেকে মাসিক ১০০০ টাকা বেশি বেতন পান। এ ছাড়া, অন্যান্য ভাতা, বাড়িভাড়া, মালী, দারোয়ান, ঝাড়ুদার ইত্যাদি পেয়ে থাকেন এবং গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহন ব্যবহারের জন্য সমস্ত খরচ কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে দেওয়া হয়।

ক্ষমতা ও পদমর্যাদা : ভারতে প্রধানমন্ত্রী শাসনবিভাগের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হলেও সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে বিস্তৃত কোনো ব্যাখ্যা নেই। প্রকৃতপক্ষে, প্রধানমন্ত্রী যে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তা সংবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে উপলব্ধি করতে হলে প্রথাগত আইন, সাংবিধানিক বিধান ও পারিপার্শ্বিকতার আলোকে বিচার করতেই হয়।

১. রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী : সংবিধানে বলা আছে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন রাষ্ট্রপতি। অনুরূপভাবে সংবিধানের ৭৪(১) নম্বর ধারায় একথাও বলা আছে যে, রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ থাকবে এবং সংবিধানের ৭৮ নম্বর ধারায় বলা আছে প্রধানমন্ত্রী শাসন ও আইন সংক্রান্ত মন্ত্রীসভার যাবতীয় সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জানাবেন। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা

যাই হোক, ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন নামসর্বস্ব প্রধান, রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি তাঁর নামে সম্পাদিত হয়। রাষ্ট্রপতির প্রতিটি সিদ্ধান্তে প্রধানমন্ত্রী তথা মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ আবশ্যক। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শদাতা। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বোঝাপড়া যত সুসংহত হবে প্রধানমন্ত্রী তত সহজে তাঁর সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তব রূপায়ণ করতে পারবেন। উদাহরণ হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি ও তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের বোঝাপড়া আর রাজীব গান্ধি ও জৈল সিং-এর বোঝাপড়া এক না-হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দু'জনের ভূমিকায় ফারাক দেখা যায়।

২. মন্ত্রীপরিষদের প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রী : প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদের প্রধান। তিনি রাষ্ট্রপতিকে যে মর্মে পরামর্শ দেন রাষ্ট্রপতি তদনুসারে মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিয়োগ করেন অথবা দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন। মন্ত্রীসভার কোন্ ব্যক্তিকে কোন্ দপ্তর দেওয়া হবে তা প্রধানমন্ত্রী ঠিক করে দেন। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়সাধন করেন। তিনি সরকারের নীতি নিধারণ করেন এবং মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের সহায়তায় সরকারের নীতি রূপায়ণ করেন। ক্যাবিনেটে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সেজন্যই প্রধানমন্ত্রীকে ক্যাবিনেট তোরণের প্রধান স্তম্ভ বলা হয়। অবশ্য এ কথা সত্য যে, মন্ত্রীপরিষদ গঠনের সময়ে প্রধানমন্ত্রীকে কতকগুলি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হয়। যথা—(১) স্বীয় দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বদের স্থান দিতে হয়। নরসিমা রাও মন্ত্রীসভায় অর্জুন সিং, শারদ পাওয়ার, মাধব রাও সিন্ধিয়া প্রমুখকে তাই দেখা যায়। সম্ভবত, এ কারণেই প্রধানমন্ত্রীকে "সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য" (Primus inter pares) বলা হয়। (২) সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে যাতে মন্ত্রিসভার প্রতিনিধি থাকে তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। (৩) মন্ত্রীসভায় বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সদস্যরা যাতে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পায়, বিশেষ করে তপশিল জাতি ও উপজাতি, খ্রিস্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকে সুনিশ্চিত করতে হয়। (৪) ভবিষ্যতে দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য তরুণ ও উদীয়মান নেতাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় স্থান করে দিতে হয়। (৫) বর্তমানে গণমাধ্যম, শিল্পপতি এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রীসভা গঠনের সময় প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়। (৬) মোর্চা রাজনীতি (Coalition Politics) ব্যবস্থা ভারতে বিকশিত হওয়ায় কোন্ দলের উপর কোন্ দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হবে সে ব্যাপারেও প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। রেল দপ্তর নিয়ে টানাপোড়েন সর্বজনবিদিত।

মন্ত্রীপরিষদের প্রধান

সম্প্রতি ভারতের মন্ত্রীপরিষদে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা আরও বিস্তৃত হয়েছে। মন্ত্রীসভায় কাউকে রাখা না রাখা প্রধানমন্ত্রীর বিশেষাধিকারে পর্যবসিত। নজির হিসাবে বলা যায় ইন্দিরা গান্ধির ক্যাবিনেটে দু'নম্বর সদস্য প্রণব মুখোপাধ্যায়কে রাজীব গান্ধি অনায়াসে বাদ দিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। এই পরিবর্ধিত ভূমিকার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে "তারকামণ্ডলীর মধ্যে বিরাজিত চন্দ্র" (inter stellas luna minors) বলে আখ্যায়িত করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারের উপরেই মন্ত্রিসভা গঠিত হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন এবং প্রয়োজনে পুনর্বণ্টন করতে পারেন। এ ব্যাপারে রাজীব গান্ধি পরাকাষ্ঠা দেখান। মাত্র সাড়ে তিন বছরে তিনি ২৪ বার ক্যাবিনেটের রদবদল করেছিলেন।

অনুরূপভাবে, ক্যাবিনেটের সভাপতি হিসাবে তাঁরই নির্দেশে ক্যাবিনেট সভায় যাবতীয় নীতি নির্ধারিত হয়। অনেক সময়ে তিনি একক সিদ্ধান্ত নিয়ে পরবর্তীকালে তা ক্যাবিনেটে অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার রেওয়াজ গড়ে তোলেন।

৩. সংসদের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী : মন্ত্রীপরিষদচালিত সরকারের নিয়ম হল, যে দল সংসদে (নিম্নকক্ষে) সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলই ক্ষমতাসীন হয়। সুতরাং প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদের মূল নায়ক। তিনিই সরকারি নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সংসদের প্রধানমন্ত্রীর ভাগ্য নির্ভর করে তাঁর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর। কারণ সংবিধানে স্পষ্ট করে বলা আছে "মন্ত্রীসভা যৌথভাবে লোকসভার কাছে দায়ী।"

প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা হিসাবে বহুবিধ দায়িত্ব পালন করেন। যথা—(১) সংসদের সরকারের কার্যক্রম ও নীতি যথাযথভাবে উত্থাপন করা; (২) গৃহীত নীতির ব্যাখ্যা করা; (৩) দলীয় সদস্যের আচরণ

ACE Scanner

সংসদীয় নেতা

নিয়ন্ত্রণ করা; (৪) সংসদ সদস্যদের সুযোগ-সুবিধা বিতরণ করা; (৫) সংসদীয় বিতর্কে যোগদান করা এবং দলীয় কর্মী বিতর্কে জড়িয়ে পড়লে উদ্ধার করা। এ ছাড়া, তিনিই সংসদে গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলি (Bills) উত্থাপন করেন; স্পিকারকে কার্যপরিচালনায় সহযোগিতা করেন। মন্ত্রীসভা যেমন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে লোকসভার কাছে যৌথ দায়বদ্ধ তেমনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিতেও পারেন। সুতরাং সংসদের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী ব্যাপক ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী।

দলনেতা

৪. দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী : বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকারের অর্থই হল দলীয় সরকার। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব অনিবার্য। স্বাভাবিকভাবেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভিত্তি হল দলীয় আনুগত্য। দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী দলীয় নীতি নির্ধারণ করেন এবং সরকারের কর্মসূচির মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করেন। বর্তমানে সাধারণ নির্বাচনে দলের সাফল্য বা অসাফল্য প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সাফল্যের উপর নির্ভরশীল। বিশেষত, আমাদের দেশে প্রায়শই প্রধানমন্ত্রী হন দলের সর্বোচ্চ নেতা (High Command)। শাসকদলের প্রধান হিসাবে তাঁকে নির্বাচন প্রার্থীর মনোনয়ন, নির্বাচনী কৌশল, প্রচার অভিযান সব কিছুই স্থির করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীকে দলীয় শৃঙ্খলাও রক্ষা করতে হয়। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কংগ্রেস দলনেতা (হাইকমান্ড) না হওয়ায় তাঁর ক্ষমতা অনেকটাই সীমাবদ্ধ। বাস্তবে সোনিয়া গান্ধিই শেষ কথা বলেন।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, দলের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব যত সুদৃঢ় হবে তাঁর ভূমিকা ও মর্যাদা তত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী গান্ধির দলের মধ্যে নেতৃত্ব ছিল প্রশ্নাতীত। স্বাভাবিকভাবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর ভূমিকা হয় অনুরূপ। অথচ জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতৃত্বে সহবস্থান করায় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তাঁর ভূমিকাকে সংকুচিত হতে দেখি।

জাতীয় নেতা

৫. জাতির নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী : প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক বা প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে জনগণের ধারণা এই পদের মর্যাদা ও ভূমিকাকে স্থির করে দেয়। প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন প্রকার গণমাধ্যমের সহায়তায় নিজের একটি ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে চান। তিনি নিয়মিত দূরদর্শন, বেতার ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্যকে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে আগ্রহী। বিশেষত দূরদর্শন ও বেতার সরকারি নিয়ন্ত্রণে থাকায় এগুলিকে অত্যন্ত সচেতনভাবে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠার কাজে লাগান। দূরদর্শনকে "প্রধানমন্ত্রী দর্শন" বলে বহু ব্যক্তি মন্তব্যও করেন।

সুতরাং প্রধানমন্ত্রী যদি কোনো নির্দিষ্ট দলের, নির্দিষ্ট এলাকার বা নির্দিষ্ট সরকারের প্রতিমূর্তি না-হয়ে সমগ্র জাতির নেতা হিসাবে স্বীয় ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তা হলে তিনি সাফল্যের সঙ্গে ভূমিকা পালন করতে পারেন। নজিরস্বরূপ জওহরলাল নেহরু পরবর্তীকালে যখন 'চাচা নেহরু' হিসাবে পরিচিত হন বা 'জহরকোট' জাতীয় পোশাকে পরিণত হয় তখন জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী হিসাবেও তাঁর ক্ষমতার শীর্ষে উত্তীর্ণ হন। বস্তুত, দেশের সংকটে বা দেশের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রী সহজেই সফলতা আনতে পারেন যদি তিনি দলমতের ঊর্ধ্বে জাতীয় নেতার আসনে সমাসীন হন।

আন্তর্জাতিক নেতা

৬. আন্তর্জাতিক নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী : কবির ভাষায় "ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।" যদিও একথা বাস্তবায়িত হতে বহু দেরি তবু এটা স্বীকার করতে পারি না যে, বর্তমান আন্তর্জাতিকতার যুগে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কোনো ভূমিকা থাকবে না। জওহরলাল নেহরুর আমল থেকেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন

ACE Scanner

করে আসছেন। প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রনীতির রূপকার। আন্তর্জাতিক শান্তিস্থাপনে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা। সুতরাং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যদি যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেন তাহলে দেশের যে সমস্ত ছোটোখাটো বৈদেশিক সমস্যা আছে তা সহজেই অতিক্রম করতে পারেন।

বস্তুত প্রধানমন্ত্রীর হাতে পররাষ্ট্র দপ্তরের ভার সব সময়ে থাকে না। জওহরলাল নেহরু পররাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব নিজে নিলেও পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীরা সাধারণত পররাষ্ট্র দপ্তর স্বতন্ত্র কোনো মন্ত্রীর হাতে দেন। অটলবিহারী বাজপেয়ী পররাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব যশোবন্ত সিংহের হাতে অর্পণ করেন (২০০২)। বর্তমানে (২০০৯) এস. এম. কৃষ্ণা বিদেশমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বিশ্বরাজনীতিতে ভারতের প্রধান মুখপাত্র। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থাকেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে তিনিই আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তাসখন্দ চুক্তি, বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি, সিমলা চুক্তির ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীরাই করেছেন। এ ছাড়া, কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে ভারতের যে সবিশেষ ভূমিকা আছে তা প্রধানমন্ত্রীর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা : ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা শুধুমাত্র সাংবিধানিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ করলে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদার যথাযথ মূল্যায়ন হবে না। ব্যক্তিত্ব, দূরদর্শিতা, দলের উপর নিয়ন্ত্রণ, প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুপস্থিতি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে প্রসারিত করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী পদের মূল্যায়ন করলে দু'টি ধারা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে কয়েকজন প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান, অপরদিকে একদল প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সহজেই নজরে পড়ে। প্রথমোক্ত শ্রেণিতে পড়েন জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধি প্রমুখ, আর দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়েন মোরারজি দেশাই, চরণ সিং, ভি. পি. সিং, চন্দ্রশেখর, অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রমুখ।

বস্তুত, একই হস্তে প্রধানমন্ত্রীত্ব ও দলের সভাপতিত্ব, কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের অবিস্থিতি, সংবিধান সংশোধনের সহজ সুযোগ, প্রধানমন্ত্রীপদের রাষ্ট্রপতিকরণ প্রয়াস, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রীর পদকে যেমন মর্যাদাসম্পন্ন করেছে, পাশাপাশি তেমনি দলীয় কোন্দল, সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাস, সম্মিলিত সরকার গঠন, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ততা, মৌলবাদীদের কাছে আত্মসমর্পণ, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের (IMF) চাপে বিদেশি পুঁজির অবাধ প্রবেশ অনুমোদন, ডাঙ্কেল চুক্তিতে স্বাক্ষরদান প্রভৃতি কারণে প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা জনসমক্ষে হেয় হয়ে পড়েছে।

পদাধিকারী প্রধানমন্ত্রী যেভাবে পদকে কাজে লাগাবেন সে রকম পদমর্যাদা তিনি ভোগ করতে সক্ষম হবেন। তাই জওহরলাল নেহরুর বক্তব্য দিয়ে ইতি টানতে পারি। তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীই। তিনি সরকারের নীতি নির্ধারণ করেন।... সংবিধানকে বাস্তবায়িত করেন; প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারের অপরিহার্য উপাদান" ("The Prime Minister is the Prime Minister. He can lay down the policy of Government... in the Constitution; the Prime Minister is the linchpin of Government.")।

কী এবং রাষ্ট্রপতিকরণ?

১৪.৬ অধ্যক্ষ বা স্পিকার (Speaker)

লোকসভায় যিনি সভাপতিত্ব করেন তিনি স্পিকার বা অধ্যক্ষ নামে পরিচিত। ভারত সংবিধানের ৯৩ নম্বর ধারায় অধ্যক্ষ বা স্পিকার ও সহকারী অধ্যক্ষ বা ডেপুটি স্পিকারের কথা বলা আছে। এই স্পিকার পদ ব্রিটেনের কমন্স্ সভার স্পিকার পদের অনুসরণে গঠিত। সংসদের পদাধিকারীদের মধ্যে স্পিকারের পদ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

স্পিকারের শব্দগত অর্থ "বক্তা" অথচ লোকসভার স্পিকার বলতে বোঝায়, সুভায়. সি. কাশ্যপের মতে, "যিনি কথা বলেন না। আর যদি বা বলেন তা হল 'সভার' পক্ষে। তিনি বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন না, অথচ সভায় সভাপতিত্ব করেন" ("Paradoxically, Speaker seldom speaks to-day. If he speaks, he speaks for the House and not to it. He takes no part in the debate of House; he presides over the meetings of the House.")

নির্বাচন : ভারতে ব্রিটেনের ন্যায় "একদা স্পিকার সবসময়েই স্পিকার" ("Once a Speaker always a Speaker")—নীতি গৃহীত হয়নি। ফলে এখানে প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনের পর লোকসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দলই নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে স্পিকার বা অধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত করে। ব্রিটেনে স্পিকার নিয়োগে যেমন সর্বসম্মত প্রার্থী দেওয়ার রেওয়াজ আছে, ভারতে সে ধরনের ভাবনা বিশেষ দানা বাঁধেনি বা ব্রিটেনে স্পিকার পদে আসীন হবার পর কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য থাকেন না—ভারতে সে রীতিও গড়ে ওঠেনি। সম্প্রতি ভারতে একটি প্রথা প্রায় বিকশিত হবার মুখে। তা হল স্পিকার হবেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রার্থী এবং ডেপুটি স্পিকার হবেন বিরোধী দল প্রার্থী। যেমন এন. ডি. এ (N.D.A.) জোটের সমর্থক প্রার্থী জি. এম. বালযোগী ভারতের স্পিকার পদে ২০০২ সালে পর্যন্ত মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ব্রতী ছিলেন এবং ডেপুটি স্পিকার পদে কংগ্রেসের ই. এম. সইদ নির্বাচিত হন। বর্তমান স্পিকার মীরা কুমার শাসক ইউ. পি. এ. জোটের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত।

নির্বাচন

বেতন ও ভাতা : লোকসভার স্পিকারের মাসিক বেতন হল ১০০,০০০ টাকা এবং তার সাথে অন্যান্য ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা তিনি ভোগ করেন। তাঁর বেতন ও ভাতা 'ভারতের সঞ্চিত তহবিল' থেকে নির্বাহ করা হয়। এই সমস্ত খাতে ব্যয় পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষ নয়।

আজ পর্যন্ত ভারতে যাঁরা লোকসভার অধ্যক্ষ পদে আসীন হয়েছেন তাঁরা হলেন :

প্রথম	গণেশ বাসুদেব মবলঙ্কর	(১৯৫২—১৯৫৬)
দ্বিতীয়	অনন্ত শয়নম আয়েঙ্গার	(১৯৫৬—১৯৬২)
তৃতীয়	হুকুম সিং	(১৯৬২—১৯৬৭)
চতুর্থ	নীলম সঞ্জীব রেড্ডি	(১৯৬৭—১৯৬৯)
পঞ্চম	গুরুদয়াল সিং ধিলন	(১৯৬৯—১৯৭৫)
ষষ্ঠ	বলিরাম ভগৎ	(১৯৭৬—১৯৭৭)
সপ্তম	কে. এস. হেগড়ে	(১৯৭৭—১৯৮০)
অষ্টম	বলরাম জাখর	(১৯৮০—১৯৮৯)
নবম	রবি রায়	(১৯৮৯—১৯৯১)
দশম	শিবরাজ পাতিল	(১৯৯১—১৯৯৬)
একাদশ	পি. এ. সাংমা	(১৯৯৬—১৯৯৮)

PDF Scanner ACE Scanner

দ্বাদশ	জি. এম. বালযোগী	(১৯৯৮—২০০২)
ত্রয়োদশ	মনোহর যোশী	(২০০২—২০০৪)
চতুর্দশ	সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়	(২০০৪—২০০৯)
পঞ্চদশ	মীরা কুমার	(২০০৯—)

কার্যকাল ও পদচ্যুতি : অধ্যক্ষের কার্যকাল সাধারণভাবে পাঁচ বছর। তবে, লোকসভার মেয়াদ শেষ হবার আগে ভেঙে গেলে অধ্যক্ষের কার্যকালের অবসান ঘটে। সংবিধানের ৪২ তম সংশোধন করে স্পিকারের কার্যকাল ৫ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬ বছর করা হয়। ১৯৭৮ সালে ৪৪ তম সংবিধান সংশোধন করে এই বর্ধিত মেয়াদ ব্যবস্থা বাতিল করে পুনরায় ৫ বছরে ফিরিয়ে নিয়ে আনা হয়। এছাড়া, অধ্যক্ষকে ৯৪ ধারায় পদচ্যুত করার বিশেষ পদ্ধতি আছে। অধ্যক্ষকে পদচ্যুত করতে হলে ১৪ দিন পূর্বে পদচ্যুতির নোটিশ দিতে হবে। ১৪ দিন পরে ঐ প্রস্তাব সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গৃহীত হলে অধ্যক্ষকে পদচ্যুত করা যায়। দ্বিতীয়ত, অধ্যক্ষ স্বয়ং পদত্যাগপত্র পেশ করে পদ থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন। তৃতীয়ত, লোকসভার সদস্যপদ খারিজ হয়ে গেলেও অধ্যক্ষ পদচ্যুত হন। অধ্যক্ষের পদ শূন্য হলে ডেপুটি স্পিকার বা সহকারী অধ্যক্ষ অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদ একই সঙ্গে শূন্য হলে রাষ্ট্রপতি লোকসভার একজন সদস্যকে স্পিকারের কাজ চালানোর জন্য সাময়িকভাবে নিযুক্ত করেন। অনুরূপ সাধারণ নির্বাচনের পর নতুন স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি লোকসভার সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করানোর জন্য প্রোটেম স্পিকার নিযুক্ত করেন।

কার্যকাল ও পদচ্যুতি

স্পিকার বা অধ্যক্ষের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা : ভারতে অধ্যক্ষের পদ অত্যন্ত মর্যাদাব্যঞ্জক। তিনি লোকসভার প্রধান এবং লোকসভার চার দেওয়ালের মধ্যে তিনি হলেন সার্বভৌম। তিনি লোকসভায় সভাপতিত্ব করেন। সুতরাং অধ্যক্ষের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। জে. সি. জোহারী (J. C. Johari) অধ্যক্ষের কাজকে চারটি মূল ভাগে বিভক্ত করেছেন; যথা—(১) নিয়ন্ত্রণমূলক (Regulatory); (২) তত্ত্বাবধানমূলক (Supervisory), (৩) প্রশাসনমূলক (Administrative) এবং (৪) বিশেষ (Special) ক্ষমতা। এই চারটি বিভাগের কাজকে আবার ৪০টি উপবিভাগে ভাগ করেছেন। তবে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা স্পিকারের কাজগুলিকে নিম্নরূপে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি।

১. সভার কার্য পরিচালনা করা : অধ্যক্ষ বা স্পিকার লোকসভার কার্যক্রম স্থির করেন। তিনি এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। বস্তুত, কখন কোন্ বিষয় আলোচনা হবে, কে বলবেন, কতক্ষণ বলবেন তা অধ্যক্ষ ঠিক করে দেন। লোকসভায় কোনো বৈধতার প্রশ্ন দেখা দিলে অধ্যক্ষ তার নিষ্পত্তি করেন। বিল (Bill) গৃহীত হবার পূর্বে ভোটাভুটি হয়। সেই ভোট পর্ব যাতে শান্তিতে অনুষ্ঠিত হয় সে ব্যাপারে তিনি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

সভার কার্য পরিচালনা

২. সভার শৃঙ্খলা বজায় রাখা : লোকসভার সদস্য সংখ্যা বহু। নানান বিষয়ে আলোচনা-বিতর্ক চলাকালে অনেক সময়েই সভায় শৃঙ্খলার অভাব দেখা দেয়। তখন অধ্যক্ষের দায়িত্ব হল সভায় যাতে শৃঙ্খলা বজায় থাকে তার যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা। লোকসভার অধিবেশন চলাকালে কোনো সদস্য বাধা দিলে অধ্যক্ষ তাঁকে সতর্ক করে দেন। যদি কেউ সতর্কতা না মানেন তাহলে মার্শাল দিয়ে তাঁকে সভাকক্ষ থেকে বহিষ্কার করতে পারেন।

সভার শৃঙ্খলা রক্ষা করা

৩. অর্থ বিল চিহ্নিতকরণ করা : সংবিধানের ধারা অনুসারে সংসদের উভয় কক্ষে বিল উত্থাপন করা গেলেও "অর্থ বিল" শুধুমাত্র লোকসভায় উত্থাপন করা যায়। কোন্ বিলটি অর্থ বিল তা স্থির করার চূড়ান্ত ক্ষমতা স্পিকার বা অধ্যক্ষের হস্তে ন্যস্ত। এছাড়া, কোনো অর্থ বিল রাজ্যসভায় বা রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরণ করার সময়েও অধ্যক্ষকে বিলটি "অর্থ বিল" এই মর্মে শংসাপত্র দিতে হয়।

অর্থবিল চিহ্নিতকরণ

PDF Scanner ACE Scanner

৪. সদস্যদের বিশেষাধিকার সুরক্ষা করা : অধ্যক্ষ লোকসভার সদস্যদের যে সমস্ত অধিকার আছে সেগুলি তাঁরা যাতে যথাযথ ভোগ করতে পারেন সে বিষয়ে নজর রাখেন। কোনো সদস্যের অধিকার ভঙ্গ হলে তার বিচারও অধ্যক্ষ করে থাকেন।

সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ

৫. সংখ্যালঘু সদস্যদের স্বার্থরক্ষা করা : গণতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে আইনসভায় একাধিক দল থাকে। ভারতেও একাধিক দল আছে। যেমন বহু সদস্যবিশিষ্ট শাসক দল আছে, তেমনি স্বল্প সদস্যবিশিষ্ট বিরোধী দলও আছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের চাপে সংখ্যালঘু দলগুলি অসহায় বোধ করে। কিন্তু অধ্যক্ষ লোকসভায় সংখ্যালঘু সদস্যদের স্বার্থরক্ষা করেন। তাঁরা যাতে তাঁদের বক্তব্য উপস্থিত করতে পারেন অধ্যক্ষ সে ব্যাপারেও সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ

৬. কমিটি গঠন করা : নির্বাচনের পর এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতি বছরের শুরুতে লোকসভার কতকগুলি কমিটি গঠিত হয়। অধ্যক্ষ এই সমস্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত করেন। যথা গাণিতিক কমিটির সভাপতি তিনিই নিযুক্ত করেন। এই কমিটিগুলি যাতে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে অধ্যক্ষ সে ব্যাপারে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন।

কমিটি গঠন

৭. সভার কাজ স্থগিত রাখা : লোকসভায় যদি প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য না থাকে; অথবা কোনো বিতর্ককে কেন্দ্র করে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাহলে অধ্যক্ষ সভার কাজ স্থগিত রাখতে পারেন।

সভা স্থগিত রাখা

৮. নির্ণয়সূচক ভোট প্রদান : যদি কোনো বিলকে কেন্দ্র করে ভোটাভুটি হয় এবং সেই ভোটাভুটিতে উভয় পক্ষ অর্থাৎ সরকার ও বিরোধী পক্ষ সমান ভোট পায় তাহলে অধ্যক্ষ ঐ বিলের ভাগ্য নির্ধারণ করতে নির্ণয়সূচক ভোট (Casting vote) দিতে পারেন। তবে অধ্যক্ষ এ ক্ষেত্রে সরকার পক্ষেই তাঁর ভোটটি দিয়ে থাকেন।

নির্ণয়মূলক ভোট প্রদান

৯. যৌথ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা : যদি কোনো সাধারণ বিলকে কেন্দ্র করে উভয় কক্ষে তথা লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে অচলাবস্থা দেখা দেয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নিষ্পত্তিকল্পে উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশন ডাকেন। এই যৌথ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করা স্পিকারের দায়িত্ব।

যৌথ অধিবেশনে সভাপতিত্ব

১০. রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্টের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন : লোকসভার সদস্যরা তাঁদের যাবতীয় বক্তব্য অধ্যক্ষের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থিত করেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতির বাণী বা বক্তব্য অধ্যক্ষের মাধ্যমে সংসদে উপস্থাপিত হয়। সুতরাং স্পিকারই হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি ও লোকসভার মধ্যে যোগসূত্র।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে যোগসূত্র

১১. সদস্যপদ খারিজ : ভারতে দলত্যাগ নিরোধক আইন পাশ হবার ফলে লোকসভার কোনো সদস্য দল ত্যাগ করে অন্য দলে গেলে অধ্যক্ষ সেই সাংসদের সদস্য-পদ খারিজ করে দিতে পারেন অথবা তাঁকে দলহীন সাংসদ (Unattached member) বলে চিহ্নিত করতে পারেন। ভি. পি. সিং-এর সময়ে অধ্যক্ষ রবি রায় বেশ কয়েকজন লোকসভার সদস্যকে দলহীন সাংসদ বলে ঘোষণা করেন।

সংবিধানের ৩৬ থেকে ৫১ ধারায় নির্দেশমূলক নীতিগুলি বর্ণিত হয়েছে। এই নীতিগুলিকে আলোচনার সুবিধার্থে নিম্নোক্ত ৫টি ভাগে ভাগ করতে পারি।

সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নীতি

১. **সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নীতিসমূহ** : সংবিধানে ৩৮ নম্বর ধারায় মূলত সামাজিক নির্দেশ মেলে। এই ধারাতে বলা হয়েছে জনকল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্র এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে প্রয়াসী হবে যাতে জাতীয় জীবনের সকল দিকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ

২. **অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত নীতিসমূহ** : সংবিধানের ৩৯, ৪১, ৪২ ও ৪৩ নম্বর ধারাতে অর্থনৈতিক নীতিগুলি বিস্তৃতভাবে স্থান পেয়েছে। ৩৯ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র এমন নীতি অনুসরণ করবে (ক) যাতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করা যায়; (খ) যাতে ধন-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্য কয়েকজন ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত না থাকে; (গ) যাতে নারী ও পুরুষ উভয়েই সমান কাজের জন্য সমান বেতন পায়; (ঘ) যাতে নারী-পুরুষের শক্তি এবং শিশুদের কোমল বয়সের অপব্যবহার না করা হয় এবং (ঙ) যাতে শৈশব ও যৌবন শোষণের হাত থেকে মুক্তি পায়।

৪১ নম্বর ধারা অনুসারে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে যতখানি সম্ভব রাষ্ট্র জনগণের কর্মের ও শিক্ষার অধিকার রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট থাকবে। বেকার অবস্থায়, অসুখের সময়, অঙ্গহানির ফলে অসমর্থ হলে বা অন্য কোনো কারণে অসহায় অবস্থায় উপনীত হলে জনগণ যাতে সাহায্য পেতে পারে রাষ্ট্র সেজন্য সচেষ্ট হবে অর্থাৎ জনগণকে বেকার, বৃদ্ধ ও অসুস্থ অবস্থায় রাষ্ট্র সাধ্যমতো সাহায্য করবে।

৪২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র কার্যের শর্তাদি মানবোচিত করে তুলবে এবং মায়েদের জন্য প্রসূতিকালীন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করবে এবং ৪৩ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে কৃষি বা শিল্পের কাজে নিযুক্ত বা অন্য যে কোনো কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা যাতে জীবনধারণের উপযোগী বেতন, সুষ্ঠু জীবনযাত্রার মান, কাজের পর অবসর এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা পায় রাষ্ট্র সে ব্যাপারে নজর দেবে। গ্রামাঞ্চলে কুটিরশিল্পের উন্নয়নের চেষ্টা করবে।

শাসন কাঠামো সংক্রান্ত

৩. **শাসন কাঠামো সংক্রান্ত নীতিসমূহ** : সংবিধানের ৪০, ৪৪ ও ৫০ নম্বর ধারাতে শাসন কাঠামোর উন্নয়ন বিষয়ক নীতিগুলি দেখা যায়। বিশেষত ৪০ নম্বর ধারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ধারায় গ্রামীণ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্র গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন করবে। ৪৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্রের ভিতরে সকল শ্রেণির নাগরিকদের মধ্যে যাতে একই ধরনের

ACE Scanner

সামাজিক বিধি চালু হয় সেদিকে রাষ্ট্র নজর রাখবে। এছাড়া ৫০ নম্বর ধারায় বলা হয় সরকারের বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র করতে রাষ্ট্রকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. **শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত নীতিসমূহ** : রাষ্ট্রীয় নির্দেশমূলক নীতিসমূহের অন্যতম লক্ষ্য হল শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো। সংবিধানের ৪৫ থেকে ৪৭ নম্বর ধারায় এই বিষয়ক নীতিগুলি দেখা যায়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত

৪৫ নম্বর ধারাটি খুবই তাৎপর্যবহ। এ ধারাতে বলা আছে সংবিধান চালু হবার দশ বছরের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বালক-বালিকাদের আবশ্যিক ও অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। ৪৬ নম্বর ধারা অনুসারে পিছিয়ে পড়া ও দুর্বল শ্রেণিগুলিকে বিশেষ করে তপশিলি জাতি ও উপজাতির লোকদের শিক্ষিত করে তুলতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে।

৪৭ নম্বর ধারায় বলা আছে জনগণ যাতে পুষ্টিকর খাদ্য পায় সেদিকে রাষ্ট্রকে লক্ষ রাখতে হবে। জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করাও রাষ্ট্রের অন্যতম কর্তব্য হবে।

৪৯ নম্বর ধারাতে জাতীয় গৌরববর্ধক বলে ঘোষিত ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত শিল্পকলা, দ্রষ্টব্য স্থান ও বস্তুগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে।

৫. **আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র সম্পর্কিত নীতিসমূহ** : ভারত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কী ভূমিকা ও নীতি গ্রহণ করবে তা সংবিধানের ৫১ নম্বর ধারায় ব্যক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উন্নতি বিধান, জাতিসমূহের মধ্যে ন্যায়সংগত ও সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপন, আন্তর্জাতিক আইন, সন্ধি প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সালিশির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তি করতে ভারত সতত সচেষ্ট থাকবে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র সংক্রান্ত

ACE Scanner

১১.২.৩ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Powers and Functions of the President)

ভারতে ব্রিটেনের অনুকরণে সংসদীয় গণতন্ত্রব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান (Nominal Head)। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের কোথাও স্পষ্টভাবে লেখা ছিল না যে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শে তাঁর কার্য পরিচালনা করবেন বা পরিচালনা করতে বাধ্য থাকবেন। ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধন করে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ ও সাহায্য অনুযায়ী কার্য পরিচালনা করতে বাধ্য। তবে ১৯৭৮ সালে ৪৪ তম সংবিধান সংশোধন করে এই বাধ্যতাকে একটু পরিবর্তন করা হয়েছে। তদনুসারে স্থির হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রীসভা কোনো পরামর্শ দিলে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীপরিষদের কাছে ঐ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য ফেরত পাঠাতে পারেন; কিন্তু মন্ত্রীপরিষদ যদি পুনরায় ঐ সিদ্ধান্তে অবিচল থাকে তবে রাষ্ট্রপতি তা গ্রহণে বাধ্য হবেন। উদাহরণস্বরূপ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা বিহারে রাবড়ি দেবী মন্ত্রীসভা খারিজ করার জন্য প্রথম পরামর্শ জানালে রাষ্ট্রপতি তা গ্রহণ করেননি। তিনি পুনর্বিবেচনা করার জন্য তা ফেরত পাঠান, কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ঐ সিদ্ধান্তে অবিচল থেকে পুনরায় আবেদন করলে রাষ্ট্রপতি তা মানতে বাধ্য হয়েছিলেন (১৯৯৯)। তথাপি সংবিধান তাঁকে যে বিশাল ক্ষমতা দিয়েছে এবং বাস্তবে রাষ্ট্রপতি যে ক্ষমতা ভোগ করেন তার ভিত্তিতে আলোচনা করা যায়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে আলোচনার সুবিধার্থে জে. সি. জোহারীর (J. C. Johari) অনুসরণে স্বাভাবিক (Normal) এবং জরুরি (Abnormal) ক্ষমতায় ভাগ করা যায়। মনে রাখা দরকার রাষ্ট্রপতি সমস্ত ক্ষমতা মন্ত্রীসভার পরামর্শে এবং অনুমোদনক্রমে রূপায়ণ করেন।

সারণি ১১.৪

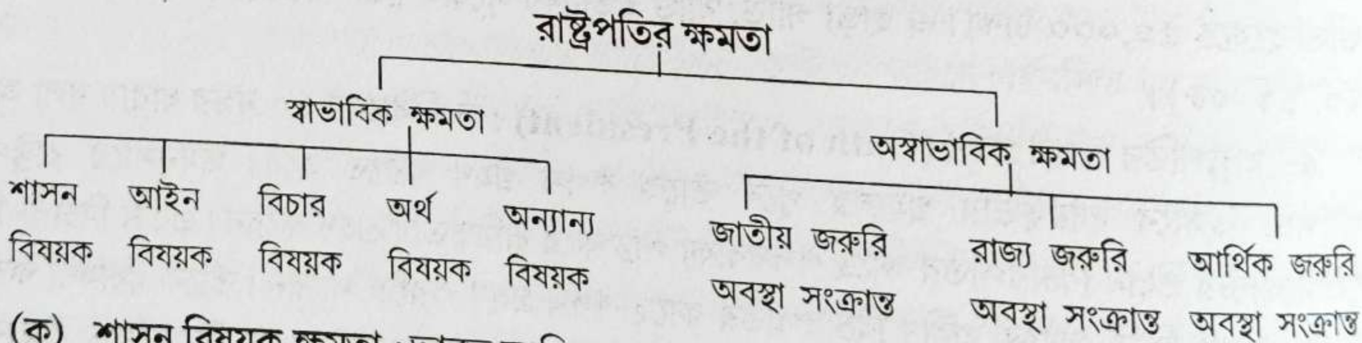

(ক) শাসন বিষয়ক ক্ষমতা : ভারত সংবিধানের ৫৩ নম্বর ধারায় বলে কেন্দ্রের শাসন বিষয়ক যাবতীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকবে। তিনি নিজে অথবা তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের সাহায্যে ঐ ক্ষমতা

PDF Scanner ACE Scanner

পেশ করার অনুমতি দেন। অতিরিক্ত বাজেট হল বার্ষিক বাজেটে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় বরাদ্দ সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, সেই পরিমাণ বরাদ্দ পর্যাপ্ত না-হলে বা নতুন কোনো বিষয়ে ব্যয় করার জন্য অথবা বছরে যে ব্যয় নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তার তুলনায় যদি বেশি ব্যয় হয়ে থাকে তাহলে ঐ অর্থের সংস্থান করা।

দ্বিতীয়ত, আকস্মিক ব্যয়-সংকুলানের জন্য ভারতের আকস্মিক ব্যয়-সংকুলান তহবিল (Contingency Fund of India) আছে। এই তহবিলের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হস্তেই ন্যস্ত। পার্লামেন্টের অনুমোদনসাপেক্ষে তিনি আকস্মিক ব্যয় নির্বাহের জন্য এই তহবিল থেকে অগ্রিম ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করতে পারেন।

তৃতীয়ত, সংবিধানের ১১০ নম্বর ধারায় অর্থ বিল সম্পর্কে দেওয়া সংজ্ঞায় বলা আছে অর্থ বিলের বিষয়বস্তুতে যা নির্ধারণ করা হয়েছে সেই সম্পর্কে কোনো বিল বা সংশোধন সংসদে পেশ করতে হলে রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমোদন প্রয়োজন। অর্থ বিল প্রথমে লোকসভায় উত্থাপিত হয়; রাজ্যসভায় এই বিল উত্থাপন করা যায় না।

চতুর্থত, আর্থিক বিষয়ে মহানিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের প্রতিবেদন (Report of CAG) সংসদে উত্থাপনের ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতিই করেন।

পঞ্চমত, কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টনের জন্য সংবিধানে অর্থ কমিশন গঠনের সংস্থান আছে। রাজস্ব বণ্টন সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশগুলি সংসদ দ্বারা অনুমোদিত হবার পর তা কার্যকর হয়। দশম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী (১৯৯৭-২০০০) কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে তাই অর্থ বণ্টন হতে দেখা যায়।

সুতরাং, রাষ্ট্রপতি যে অর্থ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী তা সহজেই বোঝা যায়।

(ঙ) **অন্যান্য ক্ষমতা :** রাষ্ট্রপতির অন্যান্য ক্ষমতা সংখ্যায় বহু। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান, আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন থেকে শুরু করে মৌলিক অধিকারসমূহ প্রদান বা রদ করার ক্ষমতা তিনি ভোগ করেন। তবে এই অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল কোনো 'জাতীয় প্রশ্নে' সন্দেহ দেখা দিলে সুপ্রিমকোর্টের কাছে মতামত দানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন। কেরল শিক্ষা বিল বা গুজরাত বিধানসভায় নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ গ্রহণ এই অন্যান্য ক্ষমতার নিদর্শন স্বরূপ।

অন্যান্য ক্ষমতা

(চ) **রাষ্ট্রপতির অস্বাভাবিক বা জরুরি ক্ষমতা (Abnormal / Emergency Power) :** জে. সি. জোহারীর মতে, "ভারতের রাষ্ট্রপতি যে অস্বাভাবিক ক্ষমতা ভোগ করেন তা সংবিধানের অষ্টাদশ অধ্যায়ে জরুরি ক্ষমতা নামে খ্যাত" ("The abnormal functions and powers of the President are contained in part XVIII of the Constitution titled 'Emergency Provisions'.")। বস্তুত দেশ সংকটজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে তাকে মোকাবিলা করার জন্য সরকারের হাতে বিশেষ ক্ষমতা থাকা দরকার। ভারতীয় সংবিধান প্রণেতাগণ এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, তাই রাষ্ট্রপতিকে জরুরি ক্ষমতায় বলীয়ান করতে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা রাখেন। তদনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতির তিন ধরনের জরুরি ক্ষমতা আছে :

জরুরি ক্ষমতা

(১) ৩৫২ নম্বর ধারা অনুসারে জাতীয় জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত **(National Emergency)** ক্ষমতা;

(২) ৩৫৬ নম্বর ধারা অনুসারে রাজ্য জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত **(State Emergency)** ক্ষমতা; এবং

(৩) ৩৬০ নম্বর ধারা অনুসারে আর্থিক জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত **(Financial Emergency)** ক্ষমতা।

PDF Scanner ACE Scanner

১. **জাতীয় জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা** : সংবিধানের ৩৫২ নম্বর ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিপ্লব দেখা দিলে বা দেখা দেবার আশঙ্কা থাকলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। মূল সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি ব্যক্তিগতভাবে মনে করলে এই ৩৫২ নম্বর ধারা প্রয়োগ করার অধিকারী ছিলেন। বর্তমানে সংবিধান সংশোধন করে বলা হয়েছে, কেবল কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের প্রস্তাবের লিখিত অনুলিপির ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

জাতীয় জরুরি অবস্থা

জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে তা এক মাসের মধ্যে সংসদের উভয়কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে অনুমোদিত হতে হবে। নতুবা তা অকার্যকর হয়ে যায়। তবে ঘোষণার সময় লোকসভা না-থাকলে (dissolve) রাজ্যসভায় এক মাসের মধ্যে অনুমোদিত হতে হবে এবং নবগঠিত লোকসভায় ৩০ দিনের মধ্যে ঐ ঘোষণাকে অনুমোদিত হতে হয়।

জাতীয় জরুরি অবস্থার সাধারণভাবে মেয়াদ হল ৬ মাস, তারপরে ৬ মাস করে মেয়াদ বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু প্রতিবারে উভয়কক্ষে একই পদ্ধতিতে অনুমোদিত হতে হবে। পূর্বের মতো একবার ঘোষিত হলে রাষ্ট্রপতি প্রত্যাহার না-করা পর্যন্ত চালু থাকার সংস্থান আর নেই। তবে ৬ মাস ৬ মাস করে জাতীয় জরুরি অবস্থা অনির্দিষ্টকাল চালু রাখা যায়।

ভারতে রাষ্ট্রপতি তিনবার এই জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। ১৯৬২ সালের অক্টোবর মাসে ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষের সময়; ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় এবং ১৯৭৫ সালের জুন মাসে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের নামে জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষিত হয়। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ভারতে দুটি কারণে, যথা—বহিরাক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য দ্বিমাত্রিক জরুরি অবস্থা (Double dose Emergency) জারি ছিল।

জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলাফল : সংবিধান অনুসরণে জোহারী (Johari) বলেন, জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে দেশের শাসনব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে—ভারত যুক্তরাষ্ট্র এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পর্যবসিত হয়। এই ঘোষণার ছ'টি প্রধান প্রভাব পরিলক্ষিত হয় :

(১) সংসদ রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে;

(২) সংসদ সরকারি কর্মচারীদের যে-কোনো কাজে নিয়োজিত করতে পারে;

(৩) সংসদ লোকসভার কার্যকালের মেয়াদ এক বছর বাড়াতে পারে;

(৪) রাষ্ট্রপতি যে-কোনো রাজ্যকে নির্দেশ দিতে পারেন;

(৫) রাষ্ট্রপতি কেন্দ্র-রাজ্যের রাজস্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারেন এবং

(৬) রাষ্ট্রপতি ঘোষণা বলে জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার ছাড়া সকল মৌলিক অধিকার ভোগ রদ করতে পারেন।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, জাতীয় জরুরি অবস্থায় সুফল অপেক্ষা কুফলের পাল্লাই ভারী। এই ঘোষণা মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চনা, সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাচার, ভীতি বা এককথায় অগণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করে।

২. **রাজ্য জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা** : সংবিধানের ৩৫৬ নম্বর ধারায় রাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত হয়েছে। রাজ্যে সাংবিধানিক অচলাবস্থা (Constitutional breakdown in the State) বা রাষ্ট্রপতির শাসন (President's Rule) নামেও রাজ্য জরুরি অবস্থা খ্যাত।

মনোনয়ন করতে পারেন। এ ছাড়া, রাজ্যসভায় ১২ জন সদস্য মনোনীত করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে নিয়োজিত। যে সমস্ত ব্যক্তি বিজ্ঞান, কলা, সাহিত্য বা সমাজসেবায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন তাঁদের মধ্য থেকেই এই ১২ জনকে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। শাবনা আজমী চলচ্চিত্র শিল্পে অনবদ্য অবদান রাখায় তাঁকে রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে মনোনীত করেন। অনুরূপ, ড. ত্রিগুণা সেন একদা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হিসাবে রাজ্যসভার মনোনীত সদস্য ছিলেন।

সদস্য মনোনয়ন

তৃতীয়ত, লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন আহ্বান করা বা অধিবেশন স্থগিত রাখা রাষ্ট্রপতির নির্দেশেই সম্পন্ন হয়। রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে লোকসভা ভেঙে দিতেও পারেন। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে, তিনি এমনভাবে অধিবেশন ডাকবেন যাতে একটি অধিবেশনের পরে পরবর্তী অধিবেশনের ব্যবধান ৬ মাসের বেশি না হয়। এ ছাড়া, যদি কোনো বিল পাসের ক্ষেত্রে লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে ঐকমত্য না হয় তা হলে রাষ্ট্রপতি উভয়কক্ষের যৌথ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন। আজ পর্যন্ত ৩ বার যৌথ অধিবেশন আহূত হয়েছে এবং সর্বশেষে আহূত হয় গত ২০০২ সালের মার্চে। এ অধিবেশনে আলোচ্য বিল ছিল পোটা (POTA)।

অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত সংক্রান্ত

চতুর্থত, রাষ্ট্রপতি সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ দেন। এই ভাষণে তিনি সরকারের ভবিষ্যৎ নীতি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এ ছাড়া, প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি সংসদে বাণী প্রেরণ করতে পারেন এবং প্রথাগতভাবে প্রতি বছর বাজেট অধিবেশনের সূচনায় তিনি ভাষণ দিয়ে থাকেন। সাধারণভাবে ক্যাবিনেট রাষ্ট্রপতির ভাষণ তৈরি করে; তবে রাষ্ট্রপতি তাঁর বিচার-বিবেচনা মতো ভাষণের পরিবর্তন করতে পারেন। ১৯৮৭ সালে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মতপার্থক্য থাকায় রাষ্ট্রপতির ভাষণেও তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল।

ভাষণদান

পঞ্চমত, রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১২৩ নম্বর ধারা অনুসারে সংসদের অধিবেশন না-চললে সাময়িক আইন বা অধ্যাদেশ (Ordinance) জারি করতে পারেন। এই অধ্যাদেশ আইনের মতোই কার্যকর। তবে পুনরায় সংসদের অধিবেশন বসলে অধ্যাদেশটি সাধারণ আইনে পরিণত করার জন্য উভয় কক্ষের কাছে পেশ করতে হয়। সংসদে এই অধ্যাদেশ গৃহীত হলে তা সাধারণ আইনে পর্যবসিত হয়। সংসদের অধিবেশন শুরু হবার পর ৪৫ দিনের মধ্যে এই অধ্যাদেশ অনুমোদিত না-হলে তা বাতিল হয়ে যায়। সাধারণ বিলের মতো সংসদ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত অধ্যাদেশকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় ও যুগ্ম তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের উপরই অধ্যাদেশ জারি করতে পারেন; তবে দেশে জরুরি অবস্থা থাকলে তিনি রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়েও অধ্যাদেশ জারি করতে সক্ষম।

অধ্যাদেশ

ষষ্ঠত, রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশই নন, তিনি রাজ্য আইন প্রণয়নেও হস্তক্ষেপ করতে পারেন। সংবিধানের ২০১ নম্বর ধারায় বলা আছে রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভা কর্তৃক গৃহীত কোনো বিলকে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের জন্য প্রেরণ করতে পারেন। এরূপ কোনো বিল এলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি না-দিলে সেই বিলটি আইনে পরিণত হতে পারে না।

রাজ্য আইন

পরিশেষে, আমরা বলতে পারি রাষ্ট্রপতির বিল বাতিল করার ক্ষমতা তথা ভিটো (Veto) ক্ষমতা আইন বিষয়ে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা। তাঁর এই ক্ষমতার তিনটি রূপ আছে, যথা—(১) চরম ভিটো (Absolute veto), (২) স্থগিতকারী ভিটো (Suspensive veto) এবং (৩) পকেট ভিটো (Pocket veto)। অনেকে এই ক্ষমতার প্রেক্ষাপটে মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার একটা ক্ষীণ সাদৃশ্য দেখে থাকে।

ভিটো ক্ষমতা

১৩.২ রাজ্যপাল (Governor)

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিতে রাজ্যপালরা হলেন রাজ্যের প্রধান। তাঁদের নামে রাজ্য শাসিত হয়। তাঁরাই রাজ্যের প্রথম নাগরিক। তাঁরাই হলেন রাজ্যের প্রধান শাসক। J. C. Johari-র ভাষায়, "The Governor (Rajyapal) is the constitutional head of the State Government in a formal sense, in real sense, he is an agent or a representative of the Centre."

সাংবিধানিক ব্যবস্থা

সংবিধানের ১৫৩ নম্বর ধারায় প্রতিটি রাজ্যে একজন করে রাজ্যপাল থাকবে বলে ঘোষিত হয়েছে। তবে একাধিক রাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপালকে দায়িত্ব গ্রহণ করতেও দেখা যায়। রাজ্যপাল এল. পি. সিং বা বি. কে. নেহরু একদা একসঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৫টি রাজ্য, যথা— অসম, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা ও নাগাল্যান্ডের রাজ্যপাল ছিলেন।

রাজ্যপাল নিয়োগ

নিয়োগ : সংবিধানের ১৫৫ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে নিয়োগপত্র দেন। এই নিয়োগকে কেন্দ্র করে রাজ্য-কেন্দ্রের মধ্যে অনেক সময় বিতর্ক দেখা দেওয়ায় রাজ্যপালকে নিয়োগপত্র দেবার সময় সংশ্লিষ্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়ার একটি সুস্থ রীতি গড়ে উঠেছে। তবে মাঝে মাঝে এই রীতি লঙঘন করতেও দেখা যায়। রাজ্যপাল নিয়োগের পূর্বে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা করেই রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন। গণপরিষদে রাজ্যপাল নিয়োগ সম্পর্কে ৩টি প্রস্তাব আলোচিত হয়। **প্রথমত,** সংবিধান প্রণেতাদের একাংশ বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় ভারতেও রাজ্যপাল জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হবেন। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয়। কারণ রাজ্যপাল জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর ন্যায় সম-ক্ষমতার দাবিদার হবেন। অথবা তিনি রাজ্যের অধিবাসী হিসাবে নিজেকে রাজ্যের বাইরে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে বিচার করতে বা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। অনুরূপভাবে, জনগণ দ্বারা প্রত্যক্ষ নির্বাচিত রাজ্যপাল কেন্দ্রের এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে অস্বীকার করবেন। সুতরাং এসব কারণে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত রাজ্যপাল প্রস্তাব বাতিল হয়।

দ্বিতীয়ত, অপর মতের সমর্থকরা প্রস্তাব করেন যে, রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। এই মতও গ্রহণ করা হয়নি। কারণ আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হলে রাজ্যপাল সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হয়ে পড়বেন। তিনি নিরপেক্ষভাবে সকলের স্বার্থে দলমতের উর্ধ্বে থেকে নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকা পালন করতে পারবেন না। সুতরাং দ্বিতীয় মতও প্রত্যাখ্যাত হয়।

তৃতীয়ত, গণপরিষদের খসড়া রচনার ভারপ্রাপ্ত কমিটি অন্য প্রস্তাবে বলে যে, রাজ্য আইনসভা চারজন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করবে এবং ঐ চারজনের মধ্য থেকে একজনকে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল হিসাবে নিয়োগপত্র দেবেন। কিন্তু এ প্রস্তাব গৃহীত হয়নি, কারণ তাহলে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের ধারণার সঙ্গে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না।

ফলে রাজ্যপাল যিনি আঞ্চলিকতা ও সংকীর্ণ প্রাদেশিক স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে জাতীয় স্বার্থে আত্মনিয়োগ করবেন সেই লক্ষ্যে গণপরিষদ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যপালের নিয়োগকেই চূড়ান্ত করে। ১৫৫ ধারায় তাই প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, রাজ্যপাল নিয়োগের সময় তাই ভারতের অখণ্ডতার কথা মনে রেখে সাধারণত সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অধিবাসীদের রাজ্যপাল পদে নিয়োগ করা হয় না।

যোগ্যতা : রাষ্ট্রপতির মতো রাজ্যপালকে ভারতের নাগরিক ও ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হয়। তিনি কোনো সরকারি কর্মচারী হবেন না। তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভার বা রাজ্য আইনসভার কোনো কক্ষের সদস্য হতে

পারবেন না। সমস্ত সময়ের রাজ্যপাল পদে নিযুক্তির পূর্বে সেই সদস্যপদ ত্যাগ করতে হয়। রাজ্যপালের নিয়োগ প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক নিয়োগ (Political appointment)। এই নিয়োগের সময় কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দিক থেকে শাসকদলের প্রতি অনুগতদের

রাজ্যপালের যোগ্যতা

বিচারপতি, আমলা, শিল্পপতি, সামরিক বিভাগের প্রাক্তন প্রধান কর্মী, প্রাক্তন মন্ত্রী, সক্রিয় রাজনৈতিক নেতাই উল্লেখ্য। কেননা কেন্দ্র এমন ব্যক্তিদের রাজ্যপাল করে পাঠায় যে রাজ্য সরকারকে অপদস্থ করতে সক্ষম। এই প্রসঙ্গে, ধর্মবীর (আমলা), শিল্পপতি (বীরেন জে. শাহ), সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় (সক্রিয় রাজনৈতিক নেতা), সুন্দর সিং ভাণ্ডারী, সিকান্দার বখত (সক্রিয় রাজনৈতিক নেতা ও রাজ্য সরকারকে অপদস্থ করতে উৎসাহী) প্রমুখের কথা বলা যায়। সম্প্রতি পত্রিকা 'এমপ্লয়মেন্ট নিউজ' (২৩শে এপ্রিল—২৯শে এপ্রিল, ২০০২), Diary of Events-এ সাপ্তাহিক এক রাজ্যপালের নিয়োগ সম্পর্কে এই বলা হয়েছে "Sikander Bakt, senior BJP leader and former Union Minister is appointed the Governor of Kerala."

কেন্দ্রের শাসকদল কর্তৃক রাজ্যপাল পদে এ ধরনের রাজনৈতিক নিয়োগের ফলে কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধ প্রায়শই দেখা যায়। সারকারিয়া কমিশনের নজর এ ব্যাপারে এড়ায়নি। তাই তাঁরা পরামর্শ দেন যে, রাজ্যপাল এমন ব্যক্তি হবেন, যিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অধিবাসী হবেন না এবং সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত থাকবেন না। দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত এ পরামর্শ মানার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

এছাড়া, রাজ্যপাল হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করার আগে তাঁকে ভারতীয় সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার শপথবাক্য পাঠ করতে হয় এবং এই শপথবাক্য পাঠ করান সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বা তাঁর অনুপস্থিতিতে হাইকোর্টের প্রবীণতম বিচারপতি। অবশ্য অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করলে দেখা যায় রাজ্যপাল পদে নিয়োগের মূল মাপকাঠি হল তাঁর কেন্দ্রীয় শাসকদলের প্রতি রাজনৈতিক আনুগত্য।

কার্যকাল : সংবিধানের ১৫৬ নম্বর ধারায় বলা আছে রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি বিধান সাপেক্ষে রাজ্যপাল

কার্যকাল

স্বপদে আসীন থাকবেন। তবে সাধারণভাবে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। যেদিন থেকে তিনি রাজ্যপালের কার্যভার গ্রহণ করেন সেদিন থেকেই তার পাঁচ বছর কার্যকাল শুরু হয়।

রাজ্যপালের বিশেষাধিকার : ভারতীয় সংবিধানে রাজ্যপাল যাতে সুষ্ঠুভাবে তাঁর কার্যাদি সম্পাদন করতে পারেন সেজন্য রাজ্যপালকে কয়েকটি বিশেষ অধিকার দিয়েছে। সেগুলি হল :

(১) রাজ্যপাল তাঁর কাজের জন্য আদালতের নিকট কৈফিয়ত দিতে বাধ্য থাকবেন না।

(২) রাজ্যপালের কার্যকালের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে কোনোপ্রকার ফৌজদারি অভিযোগ আনা যাবে না।

(৩) রাজ্যপালের কার্যকালের মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে আদালত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করতে বা তাঁকে জেলে পাঠাতে পারবে না।

(৪) ব্যক্তিগতভাবে রাজ্যপাল কর্তৃক সম্পাদিত কোনো কাজের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে দেওয়ানি অভিযোগ আনতে হলে অন্তত ২ মাস পূর্বে লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালকে জানাতে হবে।

বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা : সংসদ রাজ্যপালের বেতন ও ভাতা স্থির করে দেয়। বর্তমানে আইন

বেতন ও ভাতা

অনুসারে রাজ্যপালের মাসিক বেতন ১,১০,০০০ টাকা। এছাড়া, তিনি বাসস্থানসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। ১৫৮(৪) ধারা অনুসারে তাঁর কার্যকালের মধ্যে বেতন বা ভাতা হ্রাস করাও যায় না।

সংবিধানের ১৫৮(৩) ধারা অনুসারে রাজ্যপাল যখন দুই বা ততোধিক রাজ্যের রাজ্যপাল হিসাবে নিযুক্ত হন, তখন কোনো রাজ্য রাজ্যপালের বেতন ও ভাতার কতটা অংশ বহন করবে তা রাষ্ট্রপতি স্থির করে দেন। রাজ্যপালের বেতন, ভাতা ইত্যাদি রাজ্যের স্থায়ী সঞ্চিত তহবিল থেকে দেওয়া হয়।

তবে অনেক রাজ্যপাল বেতন হিসাবে মাসিক ১ টাকা মাত্র নিয়ে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বীরেন জে. শাহ মাত্র ১ টাকা মাসিক বেতন নেবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন।

রাজ্যপালের ক্ষমতা

ক্ষমতা : সংবিধানের ১৫৪ নম্বর ধারায় বলা আছে, "রাজ্যের শাসন বিষয়ক সমস্ত ক্ষমতা রাজ্যপালের হস্তে নিয়োজিত হবে। সংবিধান অনুসারে তিনি এই ক্ষমতাকে স্বয়ং অথবা অধঃস্তন কর্মচারীদের সহায়তায় রূপায়ণ করবেন" ("The executive power of the State shall be vested in the Governor and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution.")। বস্তুত রাজ্যপালের ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে ১৯৬৭ সালের আগে পর্যন্ত বিশেষ বিতর্ক দেখা দেয়নি। কারণ, তখন কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার বিরাজ করত। ১৯৬৭ সালে রাজ্যপালদের ক্ষমতা ও মর্যাদাকে কেন্দ্র করে ঝড় ওঠে। একদল রাজ্যপাল **সর্বোচ্চ ক্ষমতা (Maximum Power)** এবং একদল রাজ্যপাল **সর্বনিম্ন ক্ষমতা (Minimum Power)** ভোগে আগ্রহী হন। এই মিনি-ম্যাক্সির দ্বন্দ্ব মনে রেখে বাস্তবতার আলোকে রাজ্যপালদের ক্ষমতা ও মর্যাদা বিচার করা কাম্য। এবং আলোচনার সুবিধার্থে রাজ্যপালের ক্ষমতাকে শাসন বিষয়ক, আইন বিষয়ক, বিচার বিষয়ক, অর্থ বিষয়ক, জরুরি অবস্থা বিষয়ক এবং স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতায় বিভাজন করে আলোচনা করা যেতে পারে।

১. শাসন বিষয়ক ক্ষমতা : রাজ্যপালের নামেই রাজ্য শাসিত হয়। ১৫৪ নম্বর ধারায় রাজ্যপালকে রাজ্যের যাবতীয় শাসন বিষয়ক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং তিনি ১৬৪ নম্বর ধারা অনুসারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগপত্র দেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে তিনি বাকি মন্ত্রীদের নিয়োগপত্র দিয়ে থাকেন। মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগপত্র দেবার ক্ষেত্রে তিনি রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা রাজ্যে অধিক ক্ষমতা ভোগ করেন। সাধারণভাবে মন্ত্রীসভার পরামর্শ মতো তিনি কাজ করে থাকেন, কিন্তু প্রয়োজনে তিনি সেই পরামর্শ নাও মানতে পারেন। রাজ্যপালের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মন্ত্রীসভা বাতিল হয়ে যেতে পারে। **কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রীসভাকে খারিজ করার এমন ক্ষমতা ভোগ করেন না।**

শাসন বিষয়ক ক্ষমতা

দ্বিতীয়ত, তিনি তপশিল জাতি ও উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার্থে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন এবং এই মন্ত্রী সরাসরি রাজ্যপালের কাছে দায়ী থাকেন। ওড়িশা, বিহার, মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপালদের এ ধরনের শাসন বিষয়ক ক্ষমতা আছে।

তৃতীয়ত, রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদে রাজ্যপাল নিয়োগপত্র দিয়ে থাকেন। যথা—রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যকের চেয়ারম্যান (State Public Service Commission), অ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রভৃতি পদের রাজ্যপাল হলেন নিয়োগকর্তা। তিনি **স্বয়ং সমস্ত রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য।**

চতুর্থত, রাজ্যের শাসনকার্য যাতে যথাযথভাবে সম্পাদিত হতে পারে সেজন্য তিনি শাসন সংক্রান্ত নিয়মাবলি প্রণয়ন করতে পারেন।

পঞ্চমত, রাজ্যপাল মন্ত্রীসভা গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তথ্যাদি পেশ করতে বলতে পারেন, কারণ রাজ্য মন্ত্রীসভা কর্তৃক গৃহীত যাবতীয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রাজ্যপালকে অবহিত করতে মুখ্যমন্ত্রী সংবিধান অনুসারে বাধ্য। প্রয়োজনে রাজ্যপাল কোনো মন্ত্রী বিশেষের সিদ্ধান্তকেও সমগ্র মন্ত্রীসভায় বিবেচনার জন্য পেশ করতে নির্দেশ দিতে পারেন।

PDF Scanner ACE Scanner

...হওয়া একটি প্রয়োজনীয় যোগ্যতা বলে বিবেচিত।

কার্যকাল : সাধারণভাবে মুখ্যমন্ত্রীদের কার্যকাল কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় ৫ বছর। রাজ্য বিধানসভার কাছে তাঁকে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। তবে বিধানসভার মেয়াদ পূর্বেই শেষ হলে মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকালও পাঁচ বছরের আগেই শেষ হয়ে যায়।

কার্যকাল

এছাড়া, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয় এবং কার্যকাল পূর্ণ হবার পূর্বেই রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে পদচ্যুত করতে পারেন। ভারতে অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে সবথেকে দীর্ঘদিন যিনি এ পদে ব্রতী ছিলেন তিনি হলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে একটানা ২৩ বছর অতিক্রম করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সংসদীয় রীতি অনুসারে যদিও প্রকৃত প্রধান, তথাপি মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ সংবিধানে মেলে না। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে নিম্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা পর্যালোচনা করব।

ক্ষমতা

(i) রাজ্যপালের পরামর্শদাতা হিসাবে : সংবিধানের ১৬৩ নম্বর ধারায় বলা আছে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রীসভা রাজ্যপালকে পরামর্শ ও সহযোগিতা দান করবে। অনুরূপভাবে, সংবিধানের ১৬৭ নম্বর ধারা অনুসারে রাজ্য মন্ত্রীসভার গৃহীত সিদ্ধান্ত রাজ্যপালকে জ্ঞাত করাতে হয়। মন্ত্রীরা স্ব স্ব দপ্তর নিয়ে প্রয়োজনে রাজ্যপালের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন, কিন্তু মূলত তা মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমেই ঘটে থাকে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বিভাগীয় সচিবরা রাজ্যপালের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কৈলাসনাথ কাটজুর সঙ্গে রাজ্য সরকারের সচিবরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন এবং তিনিও বিভাগীয় সচিবদের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করতেন।

রাজ্যপালের পরামর্শদাতা

মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে পরামর্শ দেন। কারণ তিনিই হলেন রাজ্যপালের মুখ্য পরামর্শদাতা। তিনি প্রকৃত শাসক হিসাবে রাজ্যপাল তথা নিয়মতান্ত্রিক শাসককে নিয়মিত পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এইভাবে রাজ্যপালকে শাসন বিষয়ক যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদনে মুখ্যমন্ত্রী সহায়তা করেন। রাজ্যপালের নামে শাসনকার্য পরিচালিত হলেও আসল ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রী ভোগ করে থাকেন। রাজ্যপালের পরামর্শদাতা হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী কতটা কাজ করবেন তা নির্ভর করছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকার উপর। মুখ্যমন্ত্রী

PDF Scanner ACE Scanner

ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হলে রাজ্যপাল আলংকারিক প্রধান হিসাবে কাজ করে থাকেন। শাসনকার্যে অন্তরায় সৃষ্টি করলে রাজ্য ছাড়তে হয়—এ. পি. শর্মা এর নজির। তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হবার বহু আগেই তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে চলে যেতে হয়।

সারণি ১৩.২

একনজরে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীগণ

১ম ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (১৯৪৭-১৯৪৮)
২য় ডা. বিধানচন্দ্র রায় (১৯৪৮-১৯৬২)
৩য় শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন (১৯৬২-১৯৬৭)
৪র্থ শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায় (১৯৬৭)
৫ম ড. প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ (১৯৬৭-১৯৬৮)
৬ষ্ঠ শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায় (১৯৬৯-১৯৭১)
৭ম শ্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় (১৯৭১-১৯৭৭)
৮ম শ্রী জ্যোতি বসু (১৯৭৭-১৯৯৯)
৯ম শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (১৯৯৯-বর্তমান)

(ii) মন্ত্রীসভার নেতা হিসাবে : মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্যের মন্ত্রীদের নিয়োগ করা হয়। তাঁরা যৌথভাবে কাজ করেন। কোনো মন্ত্রী সংকট বা সমস্যার মুখোমুখি হলে মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তাঁকে সম-মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য (Primus inter pares) বলে অভিহিত করা হয়। কারণ তিনি মন্ত্রীসভার সভা আহ্বান করেন এবং সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা অনুসারে মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টিত হয় এবং মন্ত্রীসভায় যে তিন ধরনের মন্ত্রী, যথা—ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী থাকেন—তাঁদের অবস্থানও স্থির হয়। তিনি ঠিক করেন কোন্ ধরনের কতজন মন্ত্রী থাকবেন। মন্ত্রীসভার পরিধি, নিয়োগ, দপ্তর বণ্টন ইত্যাদি মুখ্যমন্ত্রী স্থির করে থাকেন। অনুরূপভাবে, কোনো মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণ করলে তাঁর মন্ত্রিত্ব চলে যায়। মুখ্যমন্ত্রী দু'ভাবে মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের মন্ত্রীসভা থেকে বাদ দিতে পারেন, যথা—(এক) কোনো মন্ত্রীকে অব্যাহতি দেবার জন্য রাজ্যপালকে অনুরোধ জানাতে পারেন; (দুই) তিনি নিজে পদত্যাগ করে নতুনভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করে অনাকাঙিক্ষত মন্ত্রীকে বাদ দিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে যতীন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনেন তা প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় তাকে মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দিতে হয়।

মন্ত্রীসভার নেতা

(iii) বিধানসভার নেতা হিসাবে : সংসদীয় সরকারের রীতি অনুযায়ী যে দল বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতা মুখ্যমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত হন। স্বাভাবিকভাবে রাজ্যের আইনসভায় মুখ্যমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলি উত্থাপন করেন। তিনি সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বিবৃতি দেন। তিনি রাজ্যপালকে বিধানসভার অধিবেশন ডাকা ও স্থগিত করার জন্য পরামর্শ দেন। এছাড়া, তিনি বিধানসভার মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে বিধানসভা ভেঙে দেবার জন্য অনুরোধ জানালে রাজ্যপাল বিধানসভা ভেঙে দিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৫ সালে রাজ্য বিধানসভার মেয়াদ শেষ হবার এক বছর পূর্বে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়। বস্তুত, মুখ্যমন্ত্রী নিজ দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য সদা সচেষ্ট থাকেন। দলীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার ব্যাপারে তাঁকেই উদ্যোগ নিতে হয়। এছাড়া, বিধানসভায় বিরোধী দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ ও প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে তৎপর হতে হয়। বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে দ্বিবিধ ভূমিকা পালন করতে

বিধানসভার নেতা

PDF Scanner ACE Scanner

হয়। যথা—(১) সরকারের প্রধান হিসাবে এবং (২) সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে। আইনসভার কাজকর্ম পরিচালনা এবং আইনসভার মর্যাদা রক্ষা করা তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

(iv) **দলের নেতা হিসাবে** : গণতান্ত্রিক সরকারের অর্থই হল দল ব্যবস্থা। গণতন্ত্রে নির্দলের কোনো স্থান নেই। সুতরাং রাজ্য সরকারগুলিতে কোনো না কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। তারাই রাজ্যে সরকার গঠন করে এবং সেই দলের নেতাই হলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য রাজনীতিতে যত ক্ষমতাশালী হবেন তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্ব ততই মর্যাদাসম্পন্ন হবে।

দলনেতা

মাঝে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পছন্দ মতো কাউকে বসাতেন, ফলে রাজ্যে সেই মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। বস্তুত, রাজ্যে দলের ভাবমূর্তি মুখ্যমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়।

(v) **রাজ্য জনগণের নেতা হিসাবে** : যদি মুখ্যমন্ত্রী ব্যাপক অংশের জনগণের নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, তাহলে সেই মুখ্যমন্ত্রী সাফল্যের শীর্ষে অতি সহজেই নিজেকে উপস্থিত করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে স্যার আইভর জেনিংসের একটি বক্তব্য প্রযোজ্য। তিনি বলেন, "He is infact much like a film star though not being employed by profit making company, he has no publicity manager to see that he hits the headlines. Even so, he must, if possible build himself a reputation." পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে এমনকি তাঁর বিরোধী পক্ষের লোকেরাও শ্রদ্ধা করায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যে সাফল্য অর্জনে তিনি সক্ষম হয়েছেন সিদ্ধার্থশংকর রায়ের পক্ষে তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। অথবা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় জননেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করায় যে মর্যাদা ভোগ করেন ঐ একই দলের প্রফুল্লচন্দ্র সেন জনগণের সেই আস্থা লাভ না করায় সেই মর্যাদা ভোগ করতে পারেননি।

জননেতা

মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদা : মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সততা, দক্ষতা, চরিত্র ও কর্মকুশলতার উপরে তাঁর মর্যাদা মূলত নির্ভর করে।

তবে সব রাজ্যের সব মুখ্যমন্ত্রী সম ক্ষমতাসম্পন্ন নন। নর্মান ডি. পামারের ভাষায়, "স্বাধীনতার অব্যবহিত কাল পরে মুখ্যমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করেছেন এমন পাঁচজন ভারতের সর্বাপেক্ষা পরিচিত রাজনৈতিক নেতা হলেন : উত্তরপ্রদেশে পণ্ডিত জি. বি. পন্থ, মাদ্রাজে সি. রাজাগোপালাচারী, পশ্চিমবঙ্গে ডাঃ বি. সি. রায়, মধ্যপ্রদেশে রবিশংকর শুক্লা এবং বোম্বাই-এ মোরারজি দেশাই। তাঁরা প্রায়শই জওহরলাল নেহেরুর পাঁচ সহযোদ্ধা বলে অভিহিত হতেন।" বস্তুত, প্রথম পর্যায়ে রাজ্যে শক্তিশালী মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি বিরল ছিল না।

সাম্প্রতিক কালে মুখ্যমন্ত্রীদের পদমর্যাদা হ্রাস পেয়েছে। জে. সি. জোহারী তাই বলেন, বিদ্যমান মুখ্যমন্ত্রীরা তিন ধরনের। যথা—দর্শনধারী (Showman), বক্তা (Spokesman) এবং পিওন (Postman) মুখ্যমন্ত্রী।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের কোনো বিচারপতিকে নিয়োগ বা বদলি করা যাবে না।

যোগ্যতা

যোগ্যতা : হাইকোর্টের বিচারপতি হতে হলে তাঁকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে এবং (১) তিনি ভারতের কোনো বিচার বিভাগীয় পদে কমপক্ষে দশ বছর আসীন, অথবা (২) তার কমপক্ষে দশ বছর এক বা একাধিক হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকবে।

সুপ্রিমকোর্টের বিচারকদের মতো হাইকোর্টের বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক পছন্দের গুরুত্বই সর্বাধিক।

কার্যকাল ও পদচ্যুতি

কার্যকাল ও পদচ্যুতি : হাইকোর্টের বিচারকগণ ৬২ বছর বয়স পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকেন। অবশ্য কার্যকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বে তিনি পদত্যাগ করতে পারেন অথবা তাঁর মৃত্যু হলে বিচারকের আসন শূন্য হয়। অসদাচরণ বা অসামর্থ্যের জন্যও রাষ্ট্রপতি বিচারপতিদের পদচ্যুত করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তা সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে অনুমোদিত হতে হয়। রাষ্ট্রপতি এককভাবে হাইকোর্টের কোনো বিচারককে পদচ্যুত করতে পারেন না।

বেতন ও ভাতা

বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা : সংবিধানে ২২১ নম্বর ধারায় রাজ্য হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা সম্পর্কে নির্দেশ আছে। ২০০৮ সালে বিধান সংশোধন করে বলা হয়েছে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাসিক ৯০ হাজার টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ মাসিক ৮০ হাজার টাকা বেতন পাবেন। এছাড়া অন্যান্য ভাতা, পেনসন, গাড়ি, ফোন ইত্যাদির সুযোগ তাঁরা ভোগ করে থাকেন। সংসদ আইন করে এই ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা হ্রাস করতে পারে না। রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে এই বেতন ও ভাতা প্রদান করা হয়।

বিচারকের সীমাবদ্ধতা

বিচারকদের সীমাবদ্ধতা : ২২০ নম্বর ধারায় বলা আছে হাইকোর্টের স্থায়ী বিচারপতিরা অবসর গ্রহণের পর হাইকোর্ট বা সুপ্রিমকোর্ট ব্যতীত অন্য কোনো আদালতে আইন ব্যবসায়ী হিসাবে কাজ করতে পারবেন না। অবশ্য সরকার তাঁদের রাজনৈতিক পদে নিয়োগ করতে পারেন। এম. সি. চাগলা বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তাঁকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হয়। রাষ্ট্রদূত, রাজ্যপাল প্রভৃতি পদে তাঁদের নিয়োগ প্রায়শই দেখা যায়। এছাড়া, হাইকোর্টের বিচারকরা পদোন্নতি হিসাবে সুপ্রিমকোর্টে বিচারকের পদে নিয়োগ পেয়ে থাকেন।

PDF Scanner ACE Scanner

হাইকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি : ভারত সংবিধানে হাইকোর্টের কার্যাবলি ও ক্ষমতা বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়নি। কিন্তু ভারতের হাইকোর্টগুলি বহু পুরাতন। যথা—১৮৬১ সালে কলকাতা ও বোম্বাই-এ হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুতরাং একই নামে একই স্থানে ভারতের অধিকাংশ হাইকোর্টগুলি বহুদিন অবস্থান করায় সংবিধান গ্রহণের প্রাক্কালে স্থির হয় যে, তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি পূর্ববৎ থাকবে। অর্থাৎ সংবিধান চালু হবার পূর্বে হাইকোর্ট যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল বর্তমানেও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। একই সঙ্গে সংবিধানের ২২৫ নম্বর ধারায় বলা আছে যে **সংবিধান** এবং **উপযুক্ত আইনসভা** কর্তৃক রচিত আইনের সীমার মধ্যে হাইকোর্টের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হবে ("Subject to the provisions of this Constitution and to the provisions of any law of the appropriate Legislature made by virtue of powers conferred on that Legislature by this Constitution...")। প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার, প্রতিটি হাইকোর্টের কর্মক্ষেত্র তথা এক্তিয়ার (Jurisdiction) সংশ্লিষ্ট রাজ্য সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে সংসদ আইন করে এই এক্তিয়ার সম্প্রসারিত করতে পারে। যেমন, গুয়াহাটি হাইকোর্টের এক্তিয়ার অসমেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়; ত্রিপুরা, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয় পর্যন্ত প্রসারিত। যাই হোক, হাইকোর্টের মূল কাজগুলি নিম্নে বর্ণিত হল :

হাইকোর্টের ক্ষমতা

১. মূল এলাকা (Original Jurisdiction) : হাইকোর্টের মূল এলাকা সংবিধানের ২২৫ নম্বর ধারায় উল্লেখিত হয়েছে। তদনুসারে রাজস্ব সংক্রান্ত (Concerning revenue) সকল বিষয়ই হাইকোর্টের মূল এলাকাভুক্ত। ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের ফলে হাইকোর্টের এই ক্ষমতা অপসৃত হয়, কিন্তু ১৯৭৮ সালে জনতা সরকারের আমলে ৪৪তম সংবিধান সংশোধন করে এই অপসারণ রোধ করা হয়। ফলে বর্তমানে হাইকোর্ট মূল এলাকায় 'রাজস্ব সংক্রান্ত' বিষয়ে যাবতীয় ক্ষমতা ভোগ করে।

মূল এলাকা

এছাড়া, কোনো বিষয় দু হাজার টাকার অধিক মূল্য জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট মামলাটি হাইকোর্টের মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হয়। অবশ্য, এই দেওয়ানি মামলা সংক্রান্ত মূল এলাকা একমাত্র কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ হাইকোর্ট ভোগ করে, অন্য হাইকোর্টগুলি এ ক্ষমতা ভোগ করে না।

আপিল এলাকা

২. আপিল এলাকা (Appellate Jurisdiction) : রাজ্য সীমানার মধ্যে হাইকোর্ট হল দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলার সর্বোচ্চ আপিল আদালত।

(ক) দেওয়ানি আপিল এলাকা : দেওয়ানি মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে জেলা জজ এবং সহকারী জেলা জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যায়। অথবা কোনো অধস্তন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজ বা সহকারী জজ রায় দিলে তার বিরুদ্ধেও হাইকোর্টে আপিল করা যায়। এছাড়া, কতকগুলি হাইকোর্টে একজন বিচারপতি কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করাও যায়। কলকাতা হাইকোর্টে এ ধরনের মামলার বহু নজির আছে।

দেওয়ানি

ফৌজদারি

(খ) ফৌজদারি আপিল এলাকা : দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ কোনো ফৌজদারি মামলায় কোনো ব্যক্তিকে সাত বছরের অধিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলে সেই রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল করা যায়।

মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত এলাকা

৩. অধিকার সংক্রান্ত এলাকা (Jurisdiction regarding Rights) : হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্টের ন্যায় অধিকার রক্ষার জন্য আদেশ, নির্দেশ বা লেখ (Writ) জারি করতে পারে। হাইকোর্টও মৌলিক অধিকার রক্ষার্থে বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রতিষেধ, অধিকার পৃচ্ছা, উৎপ্রেষণ লেখ জারি করতে পারে। বস্তুত এক্ষেত্রে

হাইকোর্ট সুপ্রিমকোর্ট অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, কারণ সুপ্রিমকোর্ট শুধু মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য লেখ জারি করার ক্ষমতায় বলীয়ান। অপরদিকে হাইকোর্ট **মৌলিক অধিকার ও অন্যান্য আইনগত অধিকার** বলবৎ করার জন্য লেখ জারি করতে পারে।

১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধন করে হাইকোর্টের এই ক্ষমতা সংকুচিত করা হলেও ১৯৭৮ সালের ৪৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করা হয়েছে।

৪. আইনের বৈধতা বিচার (Examine Validity of Law) : রাজ্যের হাইকোর্টগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে। ৪২তম সংবিধান সংশোধন করে এই ক্ষমতা হাইকোর্টের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৭৮ সালে ৪৪ তম সংবিধান সংশোধন করে আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বৈধতা বিচার

৫. অধস্তন আদালত সংক্রান্ত ক্ষমতা (Jurisdiction over the Sub-ordinate Courts) : হাইকোর্ট রাজ্যের অধস্তন আদালতগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। হাইকোর্টের পরামর্শে রাজ্যপাল জেলা জজের নিয়োগ, বদলি বা পদোন্নতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। রাজ্যপাল রাজ্যের অধস্তন আদালতের বিচার বিভাগীয় নিয়োগেও হাইকোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করেন।

অধস্তন আদালত

এছাড়া, রাজ্যের অধস্তন আদালতে বিচারাধীন মামলার সঙ্গে সংবিধানের কোনো প্রশ্ন যুক্ত থাকলে হাইকোর্ট মামলাটি স্বহস্তে বিচারের জন্য গ্রহণ করতে পারে।

উল্লিখিত বিধিবদ্ধ ক্ষমতাগুলি ছাড়া আরো কতকগুলি ক্ষমতা হাইকোর্ট ভোগ করে থাকে, যথা : (ক) হাইকোর্ট রাজ্যের অধস্তন আদালতগুলিতে কীভাবে খাতাপত্র ও হিসাবপত্র রাখতে হবে সে ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারে; (খ) নিজের প্রশাসনিক দপ্তরের পদস্থ কর্মচারীদের নিয়ুক্তি সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ন করতে পারে; (গ) হাইকোর্ট আদালত অবমাননার জন্য দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে; (ঘ) বিচারকার্য কীভাবে সম্পাদিত হবে এ ব্যাপারে হাইকোর্ট প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুন তৈরি করতে পারে; (ঙ) রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন ছাড়া বাকি সমস্ত নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি করতে পারে।

অন্যান্য ক্ষমতা

সর্বোপরি ভারতের হাইকোর্টগুলি সুপ্রিমকোর্টের ন্যায় **অভিলেখ আদালত (Court of Record)** হিসাবে কাজ করে।

হাইকোর্টের মূল্যায়ন (Evaluation) : হাইকোর্টের গঠন ও কার্যাবলি পর্যালোচনা করলে বলা যায় যে আদালত রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত হিসাবে স্বীকৃত হলেও নানান সীমাবদ্ধতা এই আদালতের মর্যাদাকে হ্রাস করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল —

(১) ভারতে বিচারব্যবস্থার অখণ্ডতা। রাজ্য বিচার ক্ষমতার শীর্ষে হাইকোর্ট অবস্থান করে না। সর্বোচ্চ আদালত হল সুপ্রিমকোর্ট। ফলে হাইকোর্ট প্রদত্ত যে-কোনো রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যায়। ... মামলা জমে আছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারক না থাকায়

কার্যকাল ও পদচ্যুতি : সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের কার্যকাল সুদীর্ঘ। তাঁরা ৬৫ বছর পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকেন। অন্যান্য সরকারি চাকরির কার্যকাল ৫৫ থেকে ৬০ বছর বয়সের মধ্যে শেষ হয়। অবশ্য কার্যকাল শেষ হবার পূর্বে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন অথবা তাঁর মৃত্যু হলে বিচারপতির আসন শূন্য হয়। এছাড়া, কার্যকাল শেষ হবার পূর্বে অক্ষমতা, সংবিধান ভঙ্গ অথবা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হলে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে অপসারণ করতে পারেন। তবে অপসারণ করার পূর্বে সংসদের উভয় কক্ষে অধিকাংশ সদস্যের এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিচারপতিকে অপসারণ করার প্রস্তাব গৃহীত না হলে রাষ্ট্রপতি এককভাবে কোনো বিচারককে পদচ্যুত করতে পারেন না। **গত ১১মে ১৯৯৩ সালে বিচারপতি ভি. রামস্বামীকে অপসারণের জন্য সংসদে অভিযুক্ত করা হয়। লোকসভায় উপস্থিত ৪০১ জন সদস্যের মধ্যে ১৯৬ জন বিরোধী সদস্য তাঁর অপসারণের পক্ষে ভোট দেন।** কিন্তু কংগ্রেসই (ই) দলের ২০১ জন সাংসদ ভোটদানে বিরত থাকায় প্রয়োজনীয় ২/৩ সংখ্যক গরিষ্ঠতা লাভ সম্ভব হয়নি। ফলে রামস্বামীকে অপসারণ করাও সম্ভব হয়নি। অথচ তদানীন্তন স্পিকার রবি রায় ও তিন জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি রামস্বামীর বিরুদ্ধে ১৪টি দুর্নীতির অভিযোগের মধ্যে ১০টি সত্য বলে রায় দেন।

কার্যকাল ও পদচ্যুতি

বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা : পর্যাপ্ত বেতন না দিলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষিত হতে পারে না। সুতরাং ভারত সংবিধানে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা বলা আছে। সম্প্রতি সংবিধান সংশোধন করে সংশোধিত বেতন হার প্রযোজ্য হয়েছে। তদনুসারে বর্তমানে প্রধান বিচারপতি ১০০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতি ৯০,০০০ টাকা মাসিক বেতন পান। এছাড়া অন্যান্য ভাতা, পেনসন, সরকারি বাসভবন, গাড়ি, ফোন ইত্যাদি সুবিধা ভোগ করে থাকেন। বিচারপতিদের যে বেতন ও ভাতা পার্লামেন্ট আইন করে স্থির করে দেয় এবং তার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত হলে তাঁর বেতন ও ভাতা হ্রাস করা যায় না। একমাত্র আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা হ্রাস করা যায়।

বেতন ও ভাতা

বিচারকদের সীমাবদ্ধতা : সংবিধানে বলা আছে সুপ্রিমকোর্টে বিচারক হিসাবে কাজ করার পর কোনো আদালতে আইনজীবী হিসাবে কাজ করতে পারবেন না। অবশ্য সরকার তাঁদের অন্য রাজনৈতিক পদে নিয়োগ করতে পারেন। বিচারকগণ রাষ্ট্রদূত, রাজ্যপাল, উপরাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগপত্র পেতে পারেন। প্রাক্তন বিচারপতি হিদায়েতুল্লা ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। এছাড়া, সুপ্রিমকোর্টের বিচারকদের প্রায়শই কমিশনের প্রধান পদে (সারকারিয়া কমিশন, ওয়াঞ্চু কমিশন) নিযুক্ত হতে দেখা যায়।

সীমাবদ্ধতা

সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Power and Functions of the Supreme Court) : সুপ্রিমকোর্টের কাজের এলাকাকে (Jurisdiction) মূলত চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়; যথা—মূল এলাকা (Original Jurisdiction), আপিল এলাকা (Appellate Juristiction), পরামর্শদান এলাকা (Advisory Jurisdiction) এবং মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত এলাকা (Jurisdiction Regarding Fundamental Rights)।

১. মূল এলাকা : যে সমস্ত মামলা একমাত্র সুপ্রিমকোর্টেই দায়ের করা যায় এবং একমাত্র সুপ্রিমকোর্ট যে সমস্ত মামলার নিষ্পত্তি করতে পারে সেই ক্ষেত্রগুলি সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে পড়ে প্রথমত,

মূল এলাকা

বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সাধারণত সুপ্রিমকোর্টের সব থেকে অভিজ্ঞ বিচারপতিকে নিয়োগ করে থাকেন। এই প্রথা স্বাধীন ভারতে গড়ে উঠলেও ১৯৭৩ সালে অভিজ্ঞ বিচারকদের বাদ দিয়ে শ্রীঅজিত নাথ রায়কে প্রধান বিচারপতি করা হয়েছিল। যাই হোক, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ১৯৯৪ থেকে এ. এস. আহমদি প্রধান বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। বর্তমানে কে জি বালাকৃষ্ণান প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

যোগ্যতা : ভারত সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রিমকোর্টের বিচারক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হতে হলে ভারতের নাগরিকত্ব ছাড়া নিম্নলিখিত তিনটি যোগ্যতার একটি থাকা আবশ্যক। যথা : (১) কোনো হাইকোর্টে কমপক্ষে ৫ বছর বিচারক হিসাবে কাজ করতে হবে; অথবা (২) ১০ বছর এক বা একাধিক হাইকোর্টের বা সুপ্রিমকোর্টে অ্যাডভোকেট হিসাবে কাজ করতে হবে; অথবা (৩) রাষ্ট্রপতির মতে একজন বিচক্ষণ আইন-বিশারদ (Distinguished Jurist) হতে হবে।

বিচারকদের যোগ্যতা

আর একটি প্রধান যোগ্যতার কথা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বিচারক পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হতে হলে শাসক দলের আস্থাভাজন হতে হয়। বিচারকের যোগ্যতা সম্পর্কে জর্জ এইচ. গ্যাডবইস (George H. Gadboise) তাই বলেন ''ভারতের সুপ্রিমকোর্টের আদর্শ বিচারকের একটি সুসংবদ্ধ ছবি হল—"ধর্মে হিন্দু, জন্মে সামাজিক আভিজাত্য, এবং অর্থনৈতিকভাবে সম্পন্ন পরিবার থেকে আসতে হবে।" অবশ্য সুপ্রিমকোর্টের একজন বিচারক সতত মুসলিম সম্প্রদায় থেকে নিযুক্ত হয়ে থাকেন। দীর্ঘদিন মহিলা বিচারপতি কেউ ছিলেন না। সুপ্রিমকোর্টের প্রথম মহিলা বিচারপতি হলেন শ্রীমতী মীরা সাহিব ফতিমা বিবি। ভারতীয় সুপ্রিমকোর্টে বিচারপতিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে ২টি ধারা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। যথা (১) বিচারপতিদের মধ্যে অন্তত একজন মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন এবং (২) সুপ্রিমকোর্টের প্রবীণতম বিচারপতি প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত হবেন।

কার্যকাল ও পদচ্যুতি : সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের কার্যকাল সুদীর্ঘ। তাঁরা ৬৫ বছর পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকেন। অন্যান্য সরকারি চাকরির কার্যকাল ৫৫ থেকে ৬০ বছর বয়সের মধ্যে শেষ হয়। অবশ্য কার্যকাল শেষ হবার পূর্বে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারেন অথবা তাঁর মৃত্যু হলে বিচারপতির আসন শূন্য হয়। এছাড়া, কার্যকাল শেষ হবার পূর্বে অক্ষমতা, সংবিধান ভঙ্গ অথবা দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত হলে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে অপসারণ করতে পারেন। তবে অপসারণ করার পূর্বে সংসদের উভয় কক্ষে অধিকাংশ সদস্যের এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে বিচারপতিকে অপসারণ করার প্রস্তাব গৃহীত না হলে রাষ্ট্রপতি এককভাবে কোনো বিচারককে পদচ্যুত করতে পারেন না। **গত ১১মে ১৯৯৩ সালে বিচারপতি ভি. রামস্বামীকে অপসারণের জন্য সংসদে অভিযুক্ত করা হয়। লোকসভায় উপস্থিত ৪০১ জন সদস্যের মধ্যে ১৯৬ জন বিরোধী সদস্য তাঁর অপসারণের পক্ষে ভোট দেন।** কিন্তু কংগ্রেসই (ই) দলের ২০১ জন সাংসদ ভোটদানে বিরত থাকায় প্রয়োজনীয় ২/৩ সংখ্যক গরিষ্ঠতা লাভ সম্ভব হয়নি। ফলে রামস্বামীকে অপসারণ করাও সম্ভব হয়নি। অথচ তদানীন্তন স্পিকার রবি রায় ও তিন জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত তদন্ত কমিটি রামস্বামীর বিরুদ্ধে ১৪টি দুর্নীতির অভিযোগের মধ্যে ১০টি সত্য বলে রায় দেন।

কার্যকাল ও পদচ্যুতি

বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা : পর্যাপ্ত বেতন না দিলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষিত হতে পারে না। সুতরাং ভারত সংবিধানে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথা বলা আছে। সম্প্রতি সংবিধান সংশোধন করে সংশোধিত বেতন হার প্রযোজ্য হয়েছে। তদনুসারে বর্তমানে প্রধান বিচারপতি ১০০,০০০ টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতি ৯০,০০০ টাকা মাসিক বেতন পান। এছাড়া অন্যান্য ভাতা, পেনসন, সরকারি বাসভবন, গাড়ি, ফোন ইত্যাদি সুবিধা ভোগ করে থাকেন। বিচারপতিদের যে বেতন ও ভাতা পার্লামেন্ট আইন করে স্থির করে দেয় এবং তার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত হলে তাঁর বেতন ও ভাতা হ্রাস করা যায় না। একমাত্র আর্থিক জরুরি অবস্থা ঘোষিত হলে বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা হ্রাস করা যায়।

বেতন ও ভাতা

বিচারকদের সীমাবদ্ধতা : সংবিধানে বলা আছে সুপ্রিমকোর্টে বিচারক হিসাবে কাজ করার পর কোনো আদালতে আইনজীবী হিসাবে কাজ করতে পারবেন না। অবশ্য সরকার তাঁদের অন্য রাজনৈতিক পদে নিয়োগ করতে পারেন। বিচারকগণ রাষ্ট্রদূত, রাজ্যপাল, উপরাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগপত্র পেতে পারেন। প্রাক্তন বিচারপতি হিদায়েতুল্লা ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। এছাড়া, সুপ্রিমকোর্টের বিচারকদের প্রায়শই কমিশনের প্রধান পদে (সারকারিয়া কমিশন, ওয়াঞ্চু কমিশন) নিযুক্ত হতে দেখা যায়।

সীমাবদ্ধতা

সুপ্রিমকোর্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলি (Power and Functions of the Supreme Court) : সুপ্রিমকোর্টের কাজের এলাকাকে (Jurisdiction) মূলত চারটি ভাগে বিভক্ত করা হয়; যথা—মূল এলাকা (Original Jurisdiction), আপিল এলাকা (Appellate Juristiction), পরামর্শদান এলাকা (Advisory Jurisdiction) এবং মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত এলাকা (Jurisdiction Regarding Fundamental Rights)।

১. মূল এলাকা : যে সমস্ত মামলা একমাত্র সুপ্রিমকোর্টেই দায়ের করা যায় এবং একমাত্র সুপ্রিমকোর্ট যে সমস্ত মামলার নিষ্পত্তি করতে পারে সেই ক্ষেত্রগুলি সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকার অন্তর্ভুক্ত। এই এলাকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মধ্যে পড়ে প্রথমত,

মূল এলাকা

(১) কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের বিরোধ;

(২) কেন্দ্রীয় সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের সঙ্গে অন্য এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের বিরোধ;

(৩) দুই বা ততোধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে বিরোধ।

উদাহরণস্বরূপ, মূল এলাকায় ১৯৬১ সালে খনি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম কেন্দ্রীয় সরকার মামলার কথা উল্লেখ করা যায়।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন সম্পর্কিত বিরোধের নিষ্পত্তির অন্যান্য ক্ষমতা সুপ্রিমকোর্ট ভোগ করে। ১৯৬৯ সালে শিবকৃপাল সিং, ফুল সিং প্রমুখ রাষ্ট্রপতি পদে ভি. ভি. গিরির নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিমকোর্টে মামলা দায়ের করেন।

মূল এলাকায় সীমাবদ্ধতা

সুপ্রিমকোর্টের মূল এলাকা প্রসঙ্গে একটি **সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখা দরকার।** সংবিধান গ্রহণের পূর্বে যেসব সন্ধি, চুক্তি, সনদ প্রভৃতি সম্পাদিত হয়েছিল এবং যা আজও কার্যকর আছে সেগুলিকে কেন্দ্র করে কোনো বিরোধ দেখা দিলে সুপ্রিমকোর্ট তা নিষ্পত্তি করতে পারে না।

আপিল এলাকা

২. আপিল এলাকা : সংবিধান অনুসারে সুপ্রিমকোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আপিল আদালত। আপিল আদালতের অর্থ হল অধস্তন আদালতে গৃহীত সিদ্ধান্তের তথা রায়ের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ করার ক্ষমতা যে আদালত ভোগ করে। ফলে সুপ্রিমকোর্টের এক বিস্তৃত আপিল এলাকা আছে যাকে মূলত চারটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা (১) সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আপিল এলাকা, (২) দেওয়ানি আপিল এলাকা, (৩) ফৌজদারি আপিল এলাকা এবং (৪) বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল এলাকা।

সংবিধানের ব্যাখ্যা

(ক) সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত আপিল এলাকা : দেওয়ানি, ফৌজদারি অথবা অন্য কোনো মামলার রায় প্রসঙ্গে যদি হাইকোর্ট প্রমাণপত্র দিয়ে বলে সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত তাহলে সেই মামলার রায়ের বিচারের জন্য সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যায়। অথবা এই মর্মে হাইকোর্ট প্রমাণপত্র না দিলেও বা দিতে অস্বীকার করলেও সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত যে-কোনো মামলা বিচারের জন্য সুপ্রিমকোর্ট স্বয়ং সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে আপিল করার অনুমতি দিতে পারে।

দেওয়ানি

(খ) দেওয়ানি আপিল এলাকা : কোনো দেওয়ানি মামলার সঙ্গে ২০,০০০ টাকা মূল্যের প্রশ্ন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকলে হাইকোর্ট উক্ত মামলায় যে রায় দেয় সেই রায়ের বিরুদ্ধে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যেত। বর্তমানে দেওয়ানি মামলার ক্ষেত্রে এই অর্থ সংক্রান্ত প্রমাণপত্রের প্রয়োজন নেই। কোনো দেওয়ানি মামলার সঙ্গে আইনের গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশ্ন জড়িত আছে, এই মর্মে শুধু হাইকোর্ট প্রমাণপত্র দিলে উক্ত মামলার রায় সম্পর্কে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যায়। এছাড়া, কোনো দেওয়ানি মামলার বিচার সুপ্রিমকোর্টে হওয়া উচিত বলে হাইকোর্ট মনে করলে সেই মামলা সম্বন্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যায়।

(গ) ফৌজদারি আপিল এলাকা : সুপ্রিমকোর্টের কাছে তিন ধরনের ফৌজদারি মামলার ক্ষেত্রে আপিল করা যায়। (ক) নিম্ন আদালতে কোনো ফৌজদারি মামলায় নির্দোষ বলে প্রমাণিত কোনো ব্যক্তিকে হাইকোর্টে মৃত্যুদণ্ড দিলে; অথবা (খ) কোনো ফৌজদারি মামলা নিম্ন আদালতে চলাকালে যদি হাইকোর্ট

ACE Scanner

স্বহস্তে ঐ মামলা তুলে নেয় এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে; অথবা (গ) কোনো ফৌজদারি মামলায় হাইকোর্ট যদি নিজে থেকে কোনো প্রমাণপত্র দিয়ে বলে যে সংশ্লিষ্ট মামলাটি সুপ্রিমকোর্টে আপিল করার যোগ্য তাহলেও উক্ত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিমকোর্টে আপিল করা যাবে।

ফৌজদারি

(ঘ) **বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল এলাকা** : সুপ্রিমকোর্টের এই তিন আপিল এলাকা ছাড়া আর একটি আপিল এলাকা আছে। এই এলাকাকে বিশেষ অনুমতির (Special leave) আপিল এলাকা বলে (১৩৬ (১) নম্বর ধারা অনুসারে) অর্থাৎ ভারতের কোনো বিচারালয় বা ট্রাইবুন্যাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়, আদেশ বা দণ্ডদানের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য সুপ্রিমকোর্ট বিশেষ অনুমতি দিতে পারে। অবশ্য সাধারণভাবে ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘিত হলে বা বিশেষ কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হলে এই ধরনের আপিলের বিশেষ অনুমতি দিয়ে থাকে। ব্যাংক কর্মচারী মামলা বা দুর্গাশংকর বনাম রঘুরাজ সিং মামলায় বিশেষ অনুমতির মাধ্যমে আপিল করতে দেখা যায়।

বিশেষ আপিল

৩. **পরামর্শদান এলাকা** : সংবিধানের ১৪৩ নম্বর ধারায় বলা আছে কোনো আইন সংক্রান্ত প্রশ্নে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে সুপ্রিমকোর্টের পরামর্শ চাইতে পারেন। সুপ্রিমকোর্ট তখন উক্ত বিষয়ে শুনানি করে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে পারে। এই পরামর্শ সুপ্রিমকোর্ট দিতে বাধ্য নয়। অনুরূপভাবে, যদি সুপ্রিমকোর্ট পরামর্শ দেয় তাহলে রাষ্ট্রপতি তা মেনে চলতেও বাধ্য নন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে, আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের কাছে যতবার পরামর্শ চেয়েছেন, সুপ্রিমকোর্ট ততবারই পরামর্শ দিয়েছে এবং সুপ্রিমকোর্ট যতবার পরামর্শ দিয়েছে রাষ্ট্রপতি ততবারই তা গ্রহণ করেছেন। ১৯৫৭ সালে কেরল শিক্ষা বিল, ১৯৫৯ সালে বেরুবাড়ি হস্তান্তর, ১৯৮২ সালে জম্মু-কাশ্মীর পুনর্বাসন বিল, ১৯৮৫ সালে সংরক্ষণ (কর্ণাটক) সংক্রান্ত প্রশ্নে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ চাইতে, সুপ্রিমকোর্টকে পরামর্শ দিতে এবং রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ গ্রহণ করতে দেখা গেছে। রাষ্ট্রপতি জে. এ. কালাম সুপ্রিমকোর্টের কাছে দাঙ্গাবিধ্বস্ত গুজরাটে নির্বাচন সম্ভব কিনা সে বিষয়ে পরামর্শ চেয়েছিলেন।

পরামর্শদান এলাকা

৪. **মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত এলাকা** : ভারত সংবিধানে ৩২ নম্বর ধারায় সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকারে বলা আছে ভারতীয় নাগরিকদের স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলি রক্ষা করার দায়িত্ব সুপ্রিমকোর্টের অর্থাৎ কোনো মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে ভারতীয় নাগরিকরা সুপ্রিমকোর্টের কাছে আবেদন করতে পারে এবং সুপ্রিমকোর্ট অধিকার রক্ষার্থে পাঁচ ধরনের নির্দেশ বা লেখা (Writ) জারি করতে পারে। যথা : (১) বন্দি প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus), (২) পরমাদেশ (Mandamus), (৩) প্রতিষেধ (Prohibition), (৪) অধিকার পৃচ্ছা (Quo Warranto) এবং (৫) উৎপ্রেষণ (Certiorari)। তবে জাতীয় জরুরি অবস্থা দেশে বলবৎ থাকলে সুপ্রিমকোর্টের এই লেখ জারির ক্ষমতা অকার্যকর হয়ে যায়।

মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত এলাকা

উপরোক্ত চারটি এলাকা ছাড়া সুপ্রিমকোর্টের অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে যা উল্লেখ করা আবশ্যক। যথা : (১) সুপ্রিমকোর্ট অভিলেখ আদালত (Court of Record) হিসাবে কাজ করে। অর্থাৎ সুপ্রিমকোর্টের রায়সমূহ ভারতে প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত এবং অন্যান্য আদালত রায় প্রদান কালে সুপ্রিমকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না।

(২) আদালত অবমাননার জন্য অবমাননাকারীকে শাস্তি দিতে পারে।

(৩) সুপ্রিমকোর্ট বিভিন্ন মামলায় নিজের দেওয়া রায় বা সিদ্ধান্তকে পুনর্বিবেচনা করতে পারে। যেমন,

দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা

১. জেলা পরিষদ (**Zilla Parishad**) : জেলা স্তরে জেলা পরিষদ হল পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর। ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে কলকাতা বাদে প্রতিটি জেলার জন্য জেলা পরিষদ গঠনের সংস্থান থাকে। অবশ্য পৌরসভা, বিজ্ঞাপিত এলাকা ও সৈন্যাবাস এলাকাকে জেলা পরিষদের এক্তিয়ারের বাইরে রাখা হয়। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি জেলার মধ্যে ১৭ টি জেলায় জেলা পরিষদ বিরাজমান (কলকাতা ও দার্জিলিং ব্যতীত)।

গঠন : গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির ন্যায় জেলা পরিষদের সদস্যরা মূলত জনগণ কর্তৃক সরাসরি নির্বাচিত। কিছু পদাধিকার বলে সদস্য থাকায় জেলা পরিষদে তিন ধরনের সদস্য দেখা যায়। যথা— (১) জেলার প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি বা ব্লক এলাকা থেকে নির্বাচিত সদস্য; (২) পদাধিকারবলে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সকল সভাপতিবৃন্দ এবং (৩) জেলা বা জেলার কোনো অংশ থেকে নির্বাচিত লোকসভা ও বিধানসভার সদস্যবৃন্দ এবং জেলায় বসবাসকারী রাজ্যসভার সদস্যগণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পঞ্চায়েতের কোনো স্তরেই জেলার মন্ত্রী সদস্য হবেন না। নবপর্যায়ে পঞ্চায়েত আইনে সরকার মনোনীত সদস্যদের সংখ্যা কমানো হয়। পূর্বে সরকার তপশিল জাতি, উপজাতি ও মহিলা-সদস্য নির্বাচিত না হলে

দু'জন করে সদস্য মনোনীত করত। ১৯৯২ সালে সংশোধিত পঞ্চায়েত আইন অনুসারে তপশিল জাতি ও তপশিল উপজাতি এবং মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের কথা বলায় মনোনীত সদস্যপদের অবসান হয়েছে। জেলা পরিষদে তপশিল জাতি, তপশিল উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসন এবং অসংরক্ষিত আসনেরও এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির ন্যায় জেলা পরিষদে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে আবর্তনশীলতার নীতি অনুসরণ করা হবে।

কার্যকাল : গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির ন্যায় জেলা পরিষদের সদস্যবৃন্দ পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। চরিত্রহীনতা এবং ফৌজদারি অপরাধের জন্য ছ'মাসের অধিক সময় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে অথবা জেলা পরিষদের সদস্যপদের মৌল যোগ্যতা হারালে অথবা জেলা পরিষদের তিনটি সভায় একাদিক্রমে অনুপস্থিত থাকলে জেলা পরিষদের সদস্যপদের অবসান ঘটে। কোনো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সরাসরি অথবা কোনো অংশীদারির মাধ্যমে কোনো চুক্তিবদ্ধ ব্যবসায়ে লিপ্ত হলে অথবা কেন্দ্র, রাজ্য বা কোনো স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অধীনে সবেতন চাকুরিতে নিযুক্ত হলে, অথবা আদালত-কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে বা দেয় কর অদেয় থাকলে জেলা পরিষদ-সদস্যকে স্বপদ থেকে অপসারিত করা যায়।

সুতরাং সাধারণভাবে জেলা পরিষদের কার্যকাল হল ৫ বছর। এই মেয়াদ শেষে নির্বাচন হয়ে থাকে। অবশ্য রাজ্য সরকার (গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির ন্যায়) যদি মনে করে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে তার ফলে কোনো জেলা পরিষদের কোনো নির্বাচনী কেন্দ্রে বা অংশে বা সমগ্র জেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়, তা হলে সরকারি গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাজ্য সরকার জেলা পরিষদের কার্যকালের মেয়াদ একাদিক্রমে ছ'মাস বৃদ্ধি করতে পারে। ছ'মাসের অতিরিক্ত সময়ের মেয়াদ বাড়াতে হলে রাজ্য আইনসভার অনুমোদন আবশ্যক।

সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি : নির্বাচনের পর জেলা পরিষদের প্রথম সভায় সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজন সভাধিপতি ও একজন সহকারী সভাধিপতি নির্বাচিত করেন। পদাধিকারবলে সদস্যপদ অর্জনকারী কোনো সদস্য সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি হতে পারেন না। সভাধিপতি হলেন জেলা পরিষদের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বসম্পন্ন পদাধিকারী। সুতরাং জেলা পরিষদের সকল কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের কার্যের তদারকি, আর্থিক ও প্রশাসনিক দায়িত্বভার তাঁকেই বহন করতে হয়। জেলা পরিষদের মুখ্য প্রশাসন আধিকারিক হিসাবে জেলাশাসক দায়িত্ব পালন করেন। পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে জেলা পরিষদের একজন সচিব ও একজন সহকারী জেলা সমাহর্তা সহকারী নির্বাহী আধিকারিক হিসাবে কাজ করেন।

বস্তুত, জেলা পরিষদের কার্যাদি অত্যন্ত ব্যাপক হওয়ায় তা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য বর্তমানে জেলা পরিষদের ১০টি স্থায়ী সমিতি আছে। এগুলি পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী সমিতির অনুরূপ। যথা— (১) অর্থ ও পরিকল্পনা, (২) জনস্বাস্থ্য, (৩) পূর্ত, (৪) কৃষি, সেচ ও সমবায়, (৫) শিক্ষা, (৬) ক্ষুদ্র শিল্প ও ত্রাণ, (৭) বন ও ভূমিসংস্কার, (৮) মৎস্য ও পশুপালন, (৯) খাদ্য ও সরবরাহ এবং (১০) বিদ্যুৎ সংক্রান্ত স্থায়ী সমিতি। ১৯৯২ সালের সংশোধিত পঞ্চায়েত আইন অনুসারে সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি ও কর্মাধ্যক্ষদের সর্বক্ষণের কর্মী হতে হবে। তাঁরা এজন্য জেলা পরিষদ তহবিল থেকে সম্মান-ভাতা পাবেন। বর্তমানে সভাধিপতি মাসিক ৩০০০ টাকা এবং সহকারী সভাধিপতি মাসিক ২৬০০ টাকা এবং কর্মাধ্যক্ষরা মাসিক ২২০০ টাকা সম্মান-ভাতা পেয়ে থাকেন। সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতিকে স্বীয় পদে নির্বাচিত হবার পূর্বে তাঁদের লিখিতভাবে অঙ্গীকার করতে হবে যে তাঁরা ঐ পদে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন, তাঁরা কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না অথবা এমন কোনো ব্যবসা, পেশা, জীবিকার সঙ্গে জড়িত হবেন না যা তাঁদের ক্ষমতা পরিচালন বা কার্যসম্পাদনে বাধা সৃষ্টি করে।

সভা : প্রতি তিনমাসে ন্যূনপক্ষে একবার জেলা পরিষদের সভা আহূত হবে। এই সভায় সভাপতিত্ব

করবেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি। তাঁদের অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্য থেকে একজনকে ঐ সভার সভাপতি হওয়ার জন্য নির্বাচিত করা হয়।

কার্যাবলি ও ক্ষমতা : গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি যে সমস্ত কার্যাদি স্বীয় এলাকায় সংগঠিত করে প্রায় অনুরূপ কার্যাদি জেলা স্তরে জেলা পরিষদ সম্পাদন করে থাকে। জেলা পরিষদ পাঁচ বছরের জন্য একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করে এবং প্রত্যেক বছরের জন্য একটি বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে পঞ্চায়েত আইন প্রদত্ত ক্ষমতাগুলিকে রূপায়িত করে। সুতরাং জেলা পরিষদ জেলার সামগ্রিক উন্নয়নে যে ব্যাপক কার্য সম্পাদন করে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হল।

১. কৃষি, পশুপালন, শিল্পাদি, সমবায় আন্দোলন, গ্রামীণ ঋণ, জল সরবরাহ, সেচ, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসালয়, হাসপাতাল, যোগাযোগ, ছাত্র কল্যাণসহ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, বয়স্কশিক্ষা, সামাজিক সমৃদ্ধি, সর্বজনীন হিত সম্পর্কিত প্রকল্প গ্রহণ ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।

২. রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার আরোপিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত করা।

৩. জনহিতকর কার্য পরিচালনা করা।

৪. বিদ্যালয়, সর্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান, লোকহিতকর সংগঠনকে সহায়ক অনুদান প্রদান করা।

৫. প্রযুক্তিগত শিক্ষা বা অন্যান্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

৬. গ্রামীণ হাট ও বাজারগুলি পরিচালনা করা।

৭. গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা।

৮. জেলার মধ্যে অবস্থিত পৌরসংস্থাগুলিকে জল সরবরাহ বা মহামারি রোধে অর্থ সাহায্য করা।

৯. আর্তদের ত্রাণের জন্য ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা।

১০. জেলাস্থ পঞ্চায়েত সমিতিগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্পসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা এবং জেলাস্তরে উন্নয়ন পরিকল্পনা স্থির করা।

১১. জেলাস্থ পঞ্চায়েত সমিতিগুলির আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা ও অনুমোদন করা।

আয়ের উৎস : জেলা পরিষদের উপরোক্ত এই ব্যাপক কর্মকাণ্ড সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য তার আয়ের উৎসসমূহকে পঞ্চায়েত আইনে চিহ্নিত করা হয়েছে। তদনুসারে জেলা পরিষদের আয়ের প্রধান উৎসগুলি হল—কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার প্রদত্ত অনুদান, রাজ্য সরকার কর্তৃক ভূমি-রাজস্বের অংশ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার প্রদত্ত ঋণ, স্বীয় সম্পদ বন্ধক রেখে ঋণ, পথকর, পূর্তকর, লাইসেন্স ফি থেকে আদায়, জেলা পরিষদ পরিচালিত কলকারখানা, বিশ্রামাগার থেকে আয়, দান ও সাহায্য থেকে প্রাপ্ত অর্থ, স্থাবর সম্পত্তি থেকে আয়, জরিমানা থেকে সংগৃহীত অর্থ ইত্যাদি। তবে জেলা পরিষদের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয়। রাজ্য সরকার বাজেটের কোনো অংশের পরিবর্তনের জন্য সুপারিশও করতে পারে।

এছাড়া, জেলা পরিষদ আয় পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সংশোধিত পঞ্চায়েত আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জেলা পরিষদের জন্য **অর্থ কমিশন** গঠন (উপধারা ৩৩)। এই অর্থ কমিশনে চেয়ারম্যান সহ ৫ জন সদস্য থাকবেন এবং তাঁরা বিখ্যাত আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ, প্রশাসক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মী হবেন। অর্থ কমিশনের দায়িত্ব হল গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদের আর্থিক অবস্থা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা। এই সুপারিশের মধ্যে (১) ধার্যকর, শুল্ক ও টোল থেকে রাজ্য সরকার কর্তৃক আদায়ীকৃত অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের মধ্যে কীভাবে বণ্টিত হবে; (২) কোনো কোনো কর, ফি, শুল্ক, বা উপ-শুল্ক থেকে সংগৃহীত অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদকে দেওয়া হবে এবং (৩) রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল থেকে কী নীতির ভিত্তিতে গ্রাম

পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদকে অনুদান দেওয়া হবে তা স্থির করা। (৪) এছাড়া, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে আর্থিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার জন্য রাজ্য সরকার নির্ধারিত যে-কোনো আর্থিক বিষয়।

অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যবর্গ ১ বছরের জন্য নিয়োগপত্র পাবেন। অবশ্য রাজ্য সরকার ইচ্ছা করলে বিজ্ঞপ্তি জারি করে কার্যকালের মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়াতে পারে। রাজ্য সরকার এই অর্থ কমিশনের সচিব ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ, বেতন ও ভাতা স্থির করবে।

অর্থ কমিশনের সুপারিশ রাজ্য সরকার গ্রহণ করবে ; প্রয়োজনে এই সুপারিশের সংশোধনও করবে। যাই করুক না কেন, তা তখন থেকে কার্যকর হবে যখন তা বিজ্ঞপ্তি মারফত গেজেটে প্রকাশিত হবে। সুতরাং বলা যায় সংশোধিত পঞ্চায়েত আইনে জেলা পরিষদের গঠন ও ভূমিকার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যবহ। বিগত ৭ম পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক মানুষ অংশগ্রহণ করে এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে জেলা পরিষদের ৪৮টি আসনের ফলাফল সারণি ২৩.৪-এ দেওয়া হল :

সারণি ২৩.৪

পশ্চিমবঙ্গ

সপ্তম পঞ্চায়েত সাধারণ নির্বাচন—২০০৮

জেলা পরিষদে দলগত চিত্র

দল	মোট
সি. পি. আই (এম)	৪৫৮
সি. পি. আই.	১৩
আর. এস. পি.	২৫
ফরওয়ার্ড ব্লক	১৮
কংগ্রেস	৯৯
তৃণমূল কংগ্রেস	১২০
বি. জে. পি.	২
অন্যান্য*	১৩
মোট	৭৪৮

* এস ইউ. সি. আই—১

২. পঞ্চায়েত সমিতি (Panchayat Samity) : ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে পূর্বের জেলা পরিষদ আইনের (১৯৬৩) ন্যায় সমষ্টি উন্নয়ন এলাকা স্তরে পঞ্চায়েত সমিতি গঠনের কথা বলা হয় অর্থাৎ দ্বিতীয় পর্যায়ের এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় "আঞ্চলিক পরিষদের স্থলাভিষিক্ত হয় "পঞ্চায়েত সমিতি।" পশ্চিমবঙ্গে সমষ্টি উন্নয়ন এলাকায় পঞ্চায়েত সমিতি গড়ে উঠেছে।

গঠন : ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যবৃন্দ মূলত জনগণের ভোটে সরাসরি নির্বাচিত হন। এছাড়া কিছু সদস্য পদাধিকার বলে আসেন। ফলে বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতিতে তিন ধরনের সদস্য দেখা যায়। যথা —

(১) জনগণ দ্বারা সরাসরি নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ। এঁরা প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা থেকে আসেন এবং প্রত্যেক গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রতি ৪৫০০ ভোটার পিছু একজন এবং অনধিক ৩ জন নির্বাচিত হবেন।

(২) পদাধিকার বলে সমষ্টি উন্নয়ন এলাকার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানবৃন্দ।

(৩) সমষ্টি উন্নয়ন এলাকার কোনো অংশ থেকে নির্বাচিত রাজ্য বিধানসভা ও লোকসভা এবং এলাকায় বসবাসকারী রাজ্যসভার সদস্যবৃন্দ। এস্তরেও পঞ্চায়েত আইন অনুসারে তপশিল জাতি ও তপশিল উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই দুই সম্প্রদায়ের সংরক্ষিত আসনের এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আইন অনুসারে তপশিল জাতি ও তপশিল উপজাতিদের মোট সংরক্ষিত আসন সংখ্যা নির্ধারণ ও নির্বাচন পদ্ধতি স্থির করা হবে অর্থাৎ পঞ্চায়েত সমিতি এলাকায় বসবাসকারী তপশিল জাতি ও তপশিল উপজাতির জনসংখ্যা হিসাব করে মোট জনসংখ্যার সমানুপাতিক হারে সংরক্ষিত আসন সংখ্যা স্থির হবে। এছাড়া ১৯৯২-এর পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত সংশোধন আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতের ন্যায় তপশিল জাতি ও তপশিল উপজাতি সহ পঞ্চায়েত সমিতির মোট আসন সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত রাখার কথা বলা হয়েছে। এবং এই আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও আবর্তনশীলতার নীতি অনুসরণ করা হবে।

কার্যকাল : ১৯৮৩ সালের সংশোধিত পঞ্চায়েত আইন অনুসারে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের পদচ্যুত করার ক্ষমতা মহকুমা শাসকের হস্তে নিয়োজিত। চরিত্রহীনতা এবং ফৌজদারি অপরাধের জন্য ছ'মাসের অধিক সময় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলে অথবা বিনা অনুমতিতে পঞ্চায়েত সমিতির তিনটি সভায় পরপর অনুপস্থিতি থাকলে অথবা দেউলিয়া, বিকৃত মস্তিষ্ক ইত্যাদি বলে প্রমাণিত হলে পঞ্চায়েত সমিতির যে-কোনো সদস্যকে পদচ্যুত করা যায়।

সভাপতি ও সহকারী সভাপতি : পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যবৃন্দ থেকে একজন সভাপতি ও একজন সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন। এঁরাই এ স্তরে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও প্রশাসনিক প্রধান। সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক (B. D. O.) পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিক এবং পদাধিকারবলে তিনি পঞ্চায়েত সমিতির সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন।

এছাড়া, পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ আধিকারিকের (E.O.P.) পদ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানদের পরামর্শ দিতে পারেন। পরিশেষে, পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে কার্যাদি যথাযথভাবে সম্পন্ন করার জন্য ১০টি স্থায়ী সমিতি যথা : (১) অর্থ ও পরিকল্পনা, (২) জনস্বাস্থ্য, (৩) পূর্ত, (৪) কৃষি, সেচ ও সমবায়, (৫) শিক্ষা, (৬) ক্ষুদ্রশিল্প, ত্রাণ ও জনকল্যাণ, (৭) বন ও ভূমিসংস্কার, (৮) মৎস্য ও পশুপালন, (৯) খাদ্য ও সরবরাহ এবং (১০) বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি সংক্রান্ত স্থায়ী সমিতি গঠনের সংস্থান আছে। যাই হোক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি বর্তমানে যথাক্রমে মাসিক ১৮০০ টাকা ও ১৪০০ টাকা সম্মান-দক্ষিণা পান। এছাড়া, কর্মাধ্যক্ষরা মাসিক ৯০০ টাকা সম্মান-দক্ষিণা পান।

পঞ্চায়েত আইন (সংশোধন)-এ বলা হয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতিকে সর্বক্ষণের কর্মী হতে হব। তাঁরা কোনো সরকারি চাকরি অথবা অন্য কোনো ব্যবসা, বৃত্তি, জীবিকা বা উপজীবিকায় নিযুক্ত থাকতে পারবেন না। এই আইনে আরও বলা হয়েছে যে রাজ্য সরকার যদি মনে করে সভাপতি বা সহকারী সভাপতি কোনো লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকার জন্য অথবা ব্যবসা, বৃত্তি, জীবিকা বা উপজীবিকার নিযুক্ত থাকার দায়িত্ব পালন সুচারুরূপে হচ্ছে না, তাহলে লিখিত আদেশ বলে সংশ্লিষ্ট সভাপতি বা সহকারী সভাপতিকে অপসারণ করতে পারবে। তবে এ ধরনের আদেশ দানের পূর্বে সরকার সংশ্লিষ্ট সভাপতি ও বা সহকারী সভাপতিকে স্বীয় বক্তব্য পেশের সুযোগ দেবে।

সভা : পূর্বে পঞ্চায়েত সমিতির প্রতি মাসে একটি সভা আহ্বান করার সংস্থান ছিল। বর্তমানে পঞ্চায়েত আইন সংশোধন করে তিন মাস অন্তর একটি করে সভা আহ্বানের কথা বলা হয়েছে। সভার স্থান, তারিখ

PDF Scanner ACE Scanner

ও সময় পূর্ববর্তী সভায় স্থিরীকৃত হয়। প্রতি সভায় সভাপতিত্ব করেন সভাপতি। তাঁর অনুপস্থিতিতে সহকারী সভাপতি সভার কাজ পরিচালনা করেন। উভয়েই অনুপস্থিত থাকলে সমিতির উপস্থিত সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি নির্বাচিত করেন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলি : নবপর্যায়ে গঠিত পঞ্চায়েত সমিতির কার্যাবলি ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে বর্ণিত হয়। তদনুসারে পঞ্চায়েত সমিতির কার্যাবলি হল—

১. কৃষি, পশুপালন, কুটির শিল্প, সমবায় আন্দোলন, গ্রামীণ বন, জল সরবরাহ, সেচ, জনস্বাস্থ্য, চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল, যোগাযোগ, ছাত্রকল্যাণ, প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা, সামাজিক সমৃদ্ধি এবং অন্যান্য সর্বজনীন জনহিতকর প্রকল্প গ্রহণ এবং আর্থিক সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা।

২. রাজ্য সরকার কর্তৃক আরোপিত যে-কোনো প্রকল্প বা কার্যক্রম বাস্তবায়িত করা।

৩. যে-কোনো জনহিতকর কার্য পরিচালনা করা বা পঞ্চায়েত সমিতির অধীনস্থ যে-কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন পরিচালনা করা।

৪. পঞ্চায়েত অধীনস্থ যে-কোনো বিদ্যালয়, জনপ্রতিষ্ঠান ও জনকল্যাণকর সংগঠনকে অনুদান প্রদান করা।

৫. জেলা পরিষদ বা গ্রাম পঞ্চায়েতকে অনুদান দেওয়া।

৬. রাজ্য সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত কোনো পৌরসভা থাকলে তার জল সরবরাহ বা মহামারি প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থাদি বাবদ ব্যয় বহন করা।

৭. আর্তদের ত্রাণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮. পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ও প্রকল্পের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা।

৯. পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির বাজেট পরীক্ষা ও অনুমোদন করা।

এছাড়া, জেলা পরিষদ বা রাজ্য সরকার-আরোপিত নানাবিধ কার্যাদিও পঞ্চায়েত সমিতি সমাধা করে থাকে।

আয়ের উৎস : উপরোক্ত কার্যাদি সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য পঞ্চায়েত আইনে পঞ্চায়েত সমিতির আয়ের উৎস নির্ধারিত করা হয়েছে। তা হল—যানবাহনের উপর ধার্য শুল্ক, রেজিস্ট্রেশন ফি, হাট ও বাজারের উপরে ধার্য লাইসেন্স ফি, জল ও রাস্তাঘাট আলোকিত করার জন্য ধার্য কর ইত্যাদি। এছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার ও জেলা পরিষদ থেকে নিয়মিত আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। পঞ্চায়েত সমিতিকে তার আয়-ব্যয় সমন্বিত বাজেট তৈরি করতে হয় এবং তা জেলা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত না হলে পঞ্চায়েত সমিতি কোনো অর্থ ব্যয় করতে পারে না। সম্প্রতি সংশোধিত পঞ্চায়েত আইন—১৯৯২, অনুসারে রাজ্য সরকার কোনো পঞ্চায়েত সমিতির এলাকাধীন ক্ষেত্রে কোনো উন্নয়ন পরিকল্পনা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করতে পারে অথবা, পঞ্চায়েত সমিতির কার্যাবলি যথাযথ সম্পাদনের জন্য কোনো আধিকারিকের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করতে পারে। সবশেষে রাজ্য সরকার পঞ্চায়েত সমিতিকে তার এলাকায় আদায়ীকৃত অর্থ থেকে তথা টোল বা ফি বাবাদ প্রাপ্ত অর্থ থেকে এক বা একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতকে সাহায্যদানের জন্য নির্দেশ দিতে পারে।

সংশোধিত পঞ্চায়েত আইনে বলা হয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতির কার্যকালের মেয়াদ তথা ৫ বছরের সময়সীমা উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। অবশ্য রাজ্য সরকার যদি মনে করে যে, পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্ভুক্ত কোনো এলাকায় বা অংশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব নয়, তাহলে সরকারি গেজেটে তা প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির কার্যকালের মেয়াদ ছ'মাস পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে। ৬ মাসের অতিরিক্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করতে চাইলে তা রাজ্য আইনসভা দ্বারা

PDF Scanner ACE Scanner

বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায় মৃত্যুর কারণে দুটি আসন শূন্য।

৩. গ্রাম পঞ্চায়েত (Gram Panchayat) : ত্রি-স্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সর্বনিম্ন স্তর গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রতি গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে আট হাজার লোক নিয়ে গঠিত এবং এক একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে গড়ে পনেরো থেকে কুড়িটি গ্রাম দেখা যায়। ১৯১৯ সালে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে যে ইউনিয়ন বোর্ড, যা ১৯৫৭ সালের গ্রাম পঞ্চায়েত আইনে 'অঞ্চল পঞ্চায়েত', ১৯৭৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনে তা গ্রাম পঞ্চায়েত নামে পরিচিত লাভ করে।

এই আইন অনুসারে কোনো একটি মৌজা বা তার অংশ অথবা পরস্পর-সংলগ্ন কয়েকটি মৌজার সমষ্টি বা তাদের অংশসমূহকে নিয়ে একটি গ্রাম গঠিত হবে। রাজ্য সরকার প্রতিটি 'গ্রামের' জন্য গ্রামের নামানুসারে "গ্রাম পঞ্চায়েত" গঠন করে।

গঠন : যে সব গ্রামবাসী বিধানসভার ভোটদাতা হিসাবে তালিকাভুক্ত তারা গোপন ভোটদান পদ্ধতির মাধ্যমে সরাসরি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের নির্বাচিত করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ভোটদাতারা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যদের নির্বাচিত করতে পারবে এবং **অনধিক তিরিশ এবং সর্বনিম্ন পাঁচজন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হবে**। কোনো গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা কত হবে তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক স্থির করে দেবেন। আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতে তপশিলভুক্ত জাতি, উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। ১৯৯২ সালের পঞ্চায়েত আইনে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ (তপশিল জাতি ও উপজাতিসহ) আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয় এবং ১৯৯৩ সালের গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে তা কার্যকরী হয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের গঠন

বস্তুত, ১৯৯২ সালে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন (সংশোধিত) অনুসারে আসন বণ্টনের ক্ষেত্রে এক নতুন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। এই আইনে তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও মহিলাদের আসন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। সংরক্ষিত ও অসংরক্ষিত উভয় আসনের এক-তৃতীয়াংশ শুধু মহিলা

ACE Scanner

প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারবে। আইনে আরও বলা আছে যে মহিলা সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে আবর্তনশীলতার পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। আবর্তনশীলতার অর্থ হল প্রতি নির্বাচনে ভিন্ন ভিন্ন এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত হবে। ১৯৯২ পঞ্চায়েত আইন অনুসারে প্রতি ৭০০ ভোটদাতার জন্য একজন প্রতিনিধি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হতে পারে।

কার্যকাল : ১৯৭৩ সালের পঞ্চায়েত আইনে গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যকালের মেয়াদ ছিল চার বছর। ১৯৮৩ সালের সংশোধিত পঞ্চায়েত আইনে কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করে পাঁচ বছর করা হয়। একবার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নির্বাচিত হলে তাকে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অপসারিত করার ক্ষমতা গ্রাম পঞ্চায়েত বা ভোটদাতাদের নেই। **শুধুমাত্র মহকুমা শাসক তাদের বিভিন্ন কারণে যথা ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে দণ্ডিত বা পরপর তিনটি বৈঠকে অনুপস্থিত হলে অথবা প্রদেয় কর বা ফি না দিলে অপসারিত করতে পারেন।**

কার্যকাল

প্রধান ও উপপ্রধান : গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যবৃন্দ থেকে একজন প্রধান ও একজন উপপ্রধান নির্বাচিত হন। এঁরাই এ স্তরের সর্বোচ্চ পদাধিকারী। সুতরাং বিহার বা হিমাচল প্রদেশের ন্যায় সরাসরি গ্রামীণ জনগণ কর্তৃক পঞ্চায়েত প্রধানের নির্বাচিত-ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গে নেই। প্রধানের অনুপস্থিতিতে উপপ্রধান প্রধানের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করেন। বর্তমানে প্রধান ও উপপ্রধানগণ যথাক্রমে মাসিক ন'শো এবং সাড়ে সাত'শো টাকা করে সম্মান-দক্ষিণা পান। এছাড়া পূর্ববর্তী অঞ্চল পঞ্চায়েতের ন্যায় নব পর্যায়ের গ্রাম পঞ্চায়েতে রাজ্য সরকার কর্তৃক কর্মসচিব নিয়োগের সংস্থানও রাখা আছে। বস্তুত, তিনি হলেন গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাহী আধিকারিক।

পদাধিকারী

সভা : প্রতি মাসে গ্রাম পঞ্চায়েতের ন্যূনতম একটি বৈঠক আহ্বান করতে হয়। এই মাসিক বৈঠক ছাড়া 'তলবি সভা' আহ্বানের ব্যবস্থাও আছে। পূর্বেকার অঞ্চল পঞ্চায়েত অপেক্ষা বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মপরিধি ব্যাপকতা লাভ করেছে। এক-তৃতীয়াংশ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য উপস্থিত হলে সভার কোরাম হয়। প্রতিটি সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধান এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে উপপ্রধান। উভয়ে অনুপস্থিত থাকলে নিজেদের মধ্যে থেকে সভার সভাপতি নির্বাচন করতে হয়। ভোট-গ্রহণের সময় কোনো প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে সমানসংখ্যক ভোট পড়লে সভাপতি একটি "নির্ণায়ক" ভোট দিতে পারেন। তবে প্রধান বা উপপ্রধানকে অপসারিত করার দাবির ভিত্তিতে আহূত সভায় সভাপতির কোনো নির্ণায়ক ভোট থাকে না।

সভা

ক্ষমতা ও কার্যাবলি : তৃণমূল-পর্যায়ে গ্রামীণ কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি আবর্তিত হওয়ায় বহুবিধ কার্যের দায়িত্ব এই সংস্থার উপরে বর্তেছে। তদনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় : (১) অবশ্য-পালনীয়, (২) অন্যান্য এবং (৩) ইচ্ছাধীন।

অবশ্য পালনীয় কর্তব্য (Obligatory Duties)

১. জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ, ময়লা নিষ্কাশন, জল নিষ্কাশন ও অপরিচ্ছন্নতা নিবারণ করা;
২. ম্যালেরিয়া, গুটি বসন্ত, কলেরা ও অন্যান্য মহামারি নিবারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৩. পানীয় জল সরবরাহ, জলাধার পরিষ্কার ও তা জীবাণুমুক্ত রাখা;
৪. জলপথ রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও নির্মাণ করা;
৫. জলপথ ও সর্বজনীন স্থানে অবৈধ দখল অপসারণ করা;
৬. গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিকানাধীন ঘরবাড়ির ও সম্পত্তি সংরক্ষণ বা মেরামত করা;
৭. সর্বজনীন পুষ্করিণী, সাধারণের গোচারণ ক্ষেত্র, শ্মশানঘাট এবং সর্বজনীন কবরখানা পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করা;

৮. জেলাশাসক, জেলাপরিষদের সভাধিপতি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাভুক্ত কোনো বিষয় সম্পর্কে তথ্য জানতে চাইলে তা সরবরাহ করা;
৯. সমাজ ও অঞ্চলের উন্নয়ন কর্মাদির জন্য স্বেচ্ছাশ্রম সংগঠিত করা;
১০. গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা;
১১. পঞ্চায়েত আইন অনুসারে কর, অভিকর (rates), মাসুল ইত্যাদি আরোপ করা এবং সংগ্রহ করা;
১২. পঞ্চায়েতের স্বীয় এলাকাধীন চৌকিদার ও দফাদারদের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা;
১৩. পঞ্চায়েত আইন অনুসারে 'ন্যায় পঞ্চায়েত' গঠন ও পরিচালনা করা এবং
১৪. গবাদি-পশুর অনধিকার প্রবেশ প্রতিরোধ করা এবং অনধিকার প্রবেশ করলে তার জরিমানা ব্যবস্থা প্রচলন করা।

অন্যান্য কর্তব্য (Other Duties)

রাজ্য সরকার যে সমস্ত কর্তব্য গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে সমর্পণ করে সেই সমস্ত কার্যাদি অন্যান্য কর্তব্য নামে চিহ্নিত। সেগুলি হল —

১. প্রাথমিক, সামাজিক, প্রযুক্তিবিদ্যাগত বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা;
২. গ্রামীণ চিকিৎসাকেন্দ্র, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রসূতিসদন ও শিশুমঙ্গলকেন্দ্র স্থাপন করা;
৩. খেয়াঘাট পরিচালনা করা;
৪. জলসেচের ব্যবস্থা করা;
৫. 'অধিক ফসল ফলাও' অভিযানকে উৎসাহিত করা;
৬. রুগ্‌ণ ও অনাথদের তত্ত্বাবধান করা;
৭. বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন দান;
৮. উন্নততর গবাদিপশুর প্রজনন, গবাদি পশুর চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা;
৯. গ্রামে সরকারি সাহায্য পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করা;
১০. পতিত জমির পুনরুদ্ধার এবং সেখানে চাষের ব্যবস্থা করা;
১১. গ্রামীণ আবাদের উন্নতি করা। যথা, 'বৃক্ষরোপণ' ইত্যাদি কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করা;
১২. অনুর্বর জমিকে চাষের উপযোগী করে গড়ে তোলা;
১৩. সমবায়-ভিত্তিতে গ্রামের জমি ও অন্যান্য সম্পদ পরিচালনার ব্যবস্থা করা;
১৪. ভূমি সংস্কার আইন বাস্তবায়িত করার কাজে সাহায্য করা—যথা, বর্গা, রেকর্ড ও বেনামি জমি উদ্ধার কার্যাদি সম্পন্ন করা;
১৫. রাজ্য সরকার অনুমোদিত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহকে বাস্তবায়িত করা;
১৬. রাজ্য সরকার কর্তৃক উন্নয়নমূলক ও জনহিতকর কার্যাদির সপক্ষে ব্যাপক প্রচারকার্য চালানো।

ইচ্ছাধীন কর্তব্য (Discretionary Duties)

যে সমস্ত দায়িত্ব গ্রাম পঞ্চায়েত স্বেচ্ছায় পালন করে সেগুলি ইচ্ছাধীন কর্তব্য বলে চিহ্নিত। তবে রাজ্য সরকার ঐরূপ কার্যের দায়িত্ব পালনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে। এরূপ নির্দেশ থাকলে গ্রাম পঞ্চায়েত উক্ত কার্যাদি পালনে বাধ্য থাকে। ইচ্ছাধীন কাজগুলি হল —

১. জনসাধারণ ব্যবহৃত রাস্তাসমূহের জন্য আলোর ব্যবস্থা করা;

PDF Scanner ACE Scanner

২. জনপথের ধারে ও অন্যান্য সর্বজনীন স্থানে বৃক্ষাদি রোপণ বা বনসৃজন করা;
৩. কূপ, পুষ্করিণী ও দিঘি খনন করা;
৪. সমবায়মূলক কৃষি-বিপণি এবং অন্যান্য সমবায়ভিত্তিক বাণিজ্যের প্রবর্তন ও উন্নতি সাধন করা;
৫. বাজার নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণ, আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন, মেলা ও হাট বসানো এবং নিয়ন্ত্রণ ও স্থানীয় কৃষিজাত দ্রব্যাদি এবং স্থানীয় হস্তশিল্প ও কুটির শিল্পজাত সামগ্রীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা;
৬. সার মজুত করার স্থান নির্ধারণ করা;
৭. সরকারি ঋণপ্রাপ্তি, বিতরণ এবং পরিশোধের বিষয়ে কৃষকদের সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান করা;
৮. অস্বাস্থ্যকর নিচু জমি ভরাট এবং অস্বাস্থ্যকর স্থানসমূহের উন্নতি সাধন করা;
৯. কুটির শিল্পের উন্নতিসাধন এবং তাতে উৎসাহ দান করা;
১০. শশক জাতীয় প্রাণী এবং বেওয়ারিশ কুকুর নিধন করা;
১১. নির্ধারিত নিয়মে খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য সামগ্রীর উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করা;
১২. সরাইখানা, ধর্মশালা, বিশ্রামাগার, গবাদিপশুর গোয়াল, মনুষ্য বা পশু-বাহিত দু'চাকা গাড়ি দাঁড়াবার স্থান নির্মাণ ও সংরক্ষণ করা;
১৩. বেওয়ারিশ গোরু বা পশুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
১৪. বেওয়ারিশ শব বা মৃত জন্তুর দায়িত্ব গ্রহণ করা;
১৫. গ্রন্থাগার এবং পাঠাগার স্থাপন ও পরিচালনা করা;
১৬. ক্লাব, আখড়া এবং আমোদ-প্রমোদ অথবা খেলাধুলার জন্য প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন তৈরি ও পরিচালনা করা;
১৭. আদমশুমারি, শস্যের পরিসংখ্যান, গবাদি পশু গণনা, বেকার ব্যক্তি ও অন্যান্য বিষয়ে পরিসংখ্যান-সম্পর্কিত নথিপত্র সংরক্ষণ করা;
১৮. জেলাপরিষদের পক্ষে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জেলাপরিষদ-অনুমোদিত কার্যাদি সম্পাদন করা;
১৯. অগ্নিকাণ্ড ঘটলে অগ্নি-নির্বাপণ এবং মানুষের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষায় সহায়তা দান করা;
২০. চুরি-ডাকাতি নিবারণে সহায়তা করা এবং
২১. জনস্বাস্থ্য, জন-স্বাচ্ছন্দ্য, জনসুবিধা ও বৈষয়িক সমৃদ্ধি করতে পারে এরূপ যে-কোনো স্থানীয় কাজ বা জনহিতকর সেবা করা।

পরিবর্তন সাধন করতে

২০.২. পৌরসভার গঠন (Composition of the Municipality)

ছোট ছোট শহরাঞ্চলের স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থা পৌরসভা (Municipality)-র মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা, চন্দননগর, হাওড়া, আসানসোল ও শিলিগুড়ি এই পাঁচটি বড় শহর ব্যতীত অন্যান্য সকল শহরের স্বায়ত্ত-শাসন পৌরসভাগুলি পরিচালনা করে। বর্তমানে [১৪টি নোটিফাইড এলাকাসহ (Notified Area Authority)] পশ্চিমবঙ্গে মোট পৌরসভার সংখ্যা হল ১১৯। এ রাজ্যের পৌরসভাগুলি ১৯৩২ সালে প্রণীত বঙ্গীয় মিউনিসিপাল আইন (Bengal Municipal Act, 1932) অনুসারে পরিচালিত হয়। তবে ঐ আইনের বহু পরিবর্তন করা হয়েছে। 'পশ্চিমবঙ্গ পৌর বিল' নামে নতুন একটি বিল রাজ্য বিধানসভায় পাস হয় ১৯৯৩ সালের ২১শে জুলাই তারিখে। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভের পর আইনটি কার্যকর হয় ১৯৯৪ সালের ১লা জুন তারিখে।

'পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন' অনুসারে পৌরসভাসমূহ ক, খ, গ, ঘ, ঙ -- এই পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত। পৌরাঞ্চলের জনসংখ্যার ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। দু'লক্ষ বা তার অধিক অধিবাসী যুক্ত পৌরাঞ্চল 'ক' শ্রেণীভুক্ত। দেড় লক্ষ থেকে অনধিক দু'লক্ষ অধিবাসীর পৌরাঞ্চল 'খ' শ্রেণীভুক্ত। অন্যূন পঁচাত্তর হাজার থেকে অনধিক দেড় লক্ষ অধিবাসী বিশিষ্ট পৌরাঞ্চল 'গ' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। অন্যূন পঁচিশ হাজার থেকে অনধিক পঁচাত্তর হাজার মানুষের পৌরাঞ্চল 'ঘ' শ্রেণীভুক্ত। এবং অনধিক পঁচিশ হাজার জনসংখ্যাযুক্ত পৌরাঞ্চল হল 'ঙ' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ACE Scanner

নতুন পৌর আইন অনুসারে এই পাঁচ শ্রেণীর পৌরাঞ্চলগুলিকে রাজ্য সরকার কতকগুলি ওয়ার্ডে বিভক্ত করতে পারে। কিন্তু কোন পৌরাঞ্চলে ওয়ার্ডের সংখ্যা নটির কম হবে না। সর্বাধিক ওয়ার্ডের সংখ্যা বিভিন্ন শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। 'ক' শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে এই সর্বাধিক সংখ্যা হল ৩৫; 'খ' শ্রেণীর ক্ষেত্রে ৩০; 'গ' শ্রেণীর ক্ষেত্রে ২৫; 'ঘ' শ্রেণীর ক্ষেত্রে ২০ এবং 'ঙ' শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে ১৫।

ওয়ার্ড

পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনে পৌরসভার সদস্যদের 'কাউন্সিলর' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কাউন্সিলররা নির্বাচিত হন সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। পৌরাঞ্চলের আঠার বছর বয়স্ক সকল অধিবাসী এই নির্বাচনে ভোটাধিকার যুক্ত।

প্রত্যেক পৌরসভার মোট আসনের অন্তত ১/৩ অংশ সংরক্ষিত রাখতে হয় মহিলাদের জন্য। প্রত্যেক পৌরসভায় তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতিদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে এই আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। সংরক্ষিত এই সমস্ত আসনের অন্তত ১/৩ অংশ সংরক্ষিত রাখতে হয় তফসিলী জাতি ও তফসিলী উপজাতির মহিলাদের জন্য।

আসন সংরক্ষণ

নতুন পৌর আইনে কাউন্সিলর পদপ্রার্থীদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কে আলোচনা আছে। কাউন্সিলর হতে গেলে কতকগুলি যোগ্যতা লাগে। এগুলি হল : (১) সংশ্লিষ্ট পৌর অঞ্চলের ভোটদাতা হতে হবে; (২) বয়স হতে হবে অন্তত একুশ বছর; (৩) দেউলিয়া বা বিকৃত মস্তিষ্কসম্পন্ন হবে না, (৪) অন্য কোন পৌরসভা, পৌর প্রতিষ্ঠান, যে-কোন স্তরের পঞ্চায়েত বা মহকুমা পরিষদের সদস্য থাকা যাবে না, (৫) পৌরসভার কোন লাভজনক পদে, পৌরসভার কোন চাকরিতে থাকা যাবে না এবং কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্যসরকার বা পৌরসভা থেকে বেতন নেওয়া যাবে না। পৌরসভার নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য রাজ্য সরকার একটি কমিশন গঠনের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। এই রাজ্য-নির্বাচন কমিশনের গঠন-ব্যবস্থা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

কাউন্সিলর পদপ্রার্থীর যোগ্যতা

পৌরসভার কর্তৃপক্ষসমূহ (The Municipal Authorities) : পশ্চিমবঙ্গের নতুন পৌর আইনে পৌরসভার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে নিম্নলিখিত তিনটি কর্তৃপক্ষের কথা বলা হয়েছে।

(১) পৌরসভা : পৌরসভা বলতে কাউন্সিলর পরিষদ (Board of Councillors)-কে বোঝায়। পৌরসভার নির্বাচিত সকল কাউন্সিলরকে নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হয়। কাউন্সিলর পরিষদের কার্যকাল হল পাঁচ বছর। কাউন্সিলর পরিষদের সদস্যরা প্রথম অধিবেশনেই নিজেদের ভিতর থেকে একজনকে সভাপতি (Chairman) হিসাবে নির্বাচিত করে। কাউন্সিলর পরিষদের সদস্যরা সভাপতি নির্বাচন করতে না পারলে, রাজ্যসরকার কাউন্সিলরদের ভিতর থেকে একজনকে সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করে। এ বিষয়ে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, নবগঠিত পৌরাঞ্চলের ক্ষেত্রে কাউন্সিলর পরিষদের সদস্যদের সরকার নিযুক্ত করতে পারে। তবে এই কাউন্সিলর পরিষদের মেয়াদ ছ'মাসের অধিক হবে না।

কাউন্সিলর পরিষদ

(২) স-পরিষদ সভাপতি (The Chairman-in-Council) : স-পরিষদ সভাপতি গঠিত হয় পৌরসভার সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংখ্যায় কাউন্সিলর নিয়ে। যেমন 'ক' শ্রেণীর পৌরসভার ক্ষেত্রে পাঁচ জন কাউন্সিলর ; 'খ' এর ক্ষেত্রে চার জন; 'গ'-এর ক্ষেত্রে তিন জন; 'ঘ'-এর ক্ষেত্রে দু'জন এবং 'ঙ'এর-ক্ষেত্রে একজন। পৌরসভার কাউন্সিলরদের ভিতর থেকে সভাপতিই মনোনীত করেন সহ-সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদের। পৌরসভার যাবতীয় প্রশাসনিক কাজকর্মের দায়িত্ব ও ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে স-পরিষদ সভাপতির হাতে। স-পরিষদ সভাপতি কাউন্সিলর পরিষদের নামে সর্বাধিক প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পাদন করে থাকে। স-পরিষদ সভাপতিকে সকল কাজকর্মের জন্য কাউন্সিলর পরিষদ বা পৌরসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়।

(৩) সভাপতি (Chairman) : পৌরসভায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সভাপতির পদটি গুরুত্বপূর্ণ। সভাপতি হলেন পৌরসভার প্রধান কার্যনির্বাহী (Executive Head)। সভাপতির কার্যকাল হল পাঁচ বছর। কার্যকালের এই নির্দিষ্ট মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার আগে তিনি নিজে পদত্যাগ করতে পারেন, আবার তিনি পদচ্যুতও হতে পারেন। সভাপতির পদচ্যুতির ব্যাপারে একটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে। কাউন্সিলর পরিষদের মোট সদস্যের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সদস্যদের লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে একটি বিশেষ সভা আহ্বান করা হয়। এই সভায় মোট সদস্যের অধিকাংশ অপসারণের পক্ষে ভোট দিলে সভাপতি অপসারিত হন। তবে এক্ষেত্রে কিছু বিধি-নিষেধের কথা বলা হয়েছে। সভাপতি নিযুক্ত হওয়ার পর ছ'মাসের মধ্যে অথবা পদচ্যুতির প্রস্তাব বাতিল হওয়ার পরে ছ'মাসের মধ্যে সভাপতিকে অপসারণের জন্য পদচ্যুতি প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় না।

সভাপতি হলেন পৌরসভার প্রধান কার্যনির্বাহী (Executive Head of the Municipality)। এই সুবাদে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে সমগ্র পৌরসভার প্রশাসন পরিচালিত হয়। তিনি পৌরসভার কাউন্সিলরদের ভিতর থেকে 'স-পরিষদ সভাপতি'-র 'সহ-সভাপতি' ও অন্যান্য সদস্যদের নিযুক্ত করেন। সভাপতি কাউন্সিলর পরিষদ এবং স-পরিষদ সভাপতির সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভাপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ স-পরিষদ সভাপতির সদস্যদের মধ্যে তিনি দায়-দায়িত্ব বণ্টন করে থাকেন। পৌরসভার সকল নথিপত্র সভাপতি সংরক্ষণ করেন। পৌরসভার প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে সভাপতি রাজ্য সরকার, জেলা কর্তৃপক্ষ, উন্নয়নমূলক বিভিন্ন সংস্থা এবং নাগরিক ও করদাতাদের সঙ্গে পৌরসভার সংযোগ সাধনের দায়িত্ব পালন করেন। সভাপতির এই দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া 'কাউন্সিলর পরিষদ' ও 'স-পরিষদ সভাপতি'-র সভায় যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব সভাপতির। তবে পৌর আধিকারিক ও কর্মচারীরা এ বিষয়ে সভাপতিকে সাহায্য করেন। আবার রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে আইনের মাধ্যমে বিবিধ কাজের দায়িত্ব সভাপতিকে দিতে পারে। তাঁকে এই সমস্ত দায়িত্বও পালন করতে হয়।

সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভাপতির ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব সম্পাদন করে থাকেন।

সহ-সভাপতির দায়িত্ব

আবার সহ সভাপতি, সভাপতির অনুপস্থিতিতে 'কাউন্সিলর পরিষদ' ও 'স-পরিষদ সভাপতি'-র সভায় সভাপতিত্ব করে থাকেন। তা ছাড়া, সহ-সভাপতির উপর আইনানুসারে বিশেষ কোন দায়িত্ব ন্যস্ত করা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে সেই দায়িত্ব সহ-সভাপতিকে সম্পাদন করতে হয়।

উপরিউক্ত তিনটি কর্তৃপক্ষ ছাড়া নতুন পৌর আইনে ওয়ার্ড-কমিটি (Wards Committee) এবং বরো কমিটি (Borough Committee) গঠনের কথা বলা হয়েছে। তা ছাড়া একটি বিশেষ কমিটি (Special Committee) এবং একটি যৌথ কমিটি (Joint Committee) গঠন করার কথা বলা হয়েছে।

ওয়ার্ড-কমিটি ঃ পৌরসভার তিন লক্ষ বা তার অধিক সংখ্যক অধিবাসী পিছু একটি বা একাধিক ওয়ার্ড নিয়ে একটি ওয়ার্ড-কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। পৌরসভাই ওয়ার্ড-কমিটি গঠনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যদি একটি ওয়ার্ড নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলর এই কমিটির সভাপতি হন। যদি দুই বা ততোধিক ওয়ার্ড নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডসমূহের প্রতিনিধিদের ভিতর থেকে একজন সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত হন। ওয়ার্ড কমিটিতে প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত কাউন্সিলর ছাড়াও কয়েকজন অন্যান্য সদস্য থাকেন। অন্যান্য সদস্যদের মনোনীত করা হয়। মনোনীত করেন সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং কাউন্সিলর পরিষদ। একটি ওয়ার্ড কমিটিতে অন্যান্য সদস্যের সংখ্যা ১৪ জন হতে পারে। ওয়ার্ডের জনসংখ্যা যদি ২,৫০০ জনের অধিক না হয়, তা হলে অন্যান্য সদস্যের সংখ্যা হবে চার জন। তার উপরে প্রতি পাঁচশ' (৫০০) জনসংখ্যা পিছু একজন করে সদস্য মনোনীত করা যাবে।

বরো কমিটি ঃ বর্তমান পৌর আইনে বরো-কমিটি গঠনের কথাও বলা হয়েছে। রাজ্য সরকার বরো-কমিটি গঠন সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করে থাকে। প্রত্যেক বরোর জন্য একটি বরো কমিটি গঠন করা হয়। বরোর অন্তর্ভুক্ত ওয়ার্ডসমূহের নির্বাচিত কাউন্সিলরদের নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়। এঁদের থেকেই একজনকে সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। রাজ্য সরকারই এই কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী নির্ধারণ করে। বরো কমিটিসমূহ স-পরিষদ সভাপতির নিয়ন্ত্রণাধীনে পৌরসভার দ্বারা অর্পিত কাজকর্ম সম্পাদন করে থাকে।

বিশেষ ও যৌথ কমিটি ঃ উপরিউক্ত দুটি কমিটি ছাড়া প্রয়োজনবোধে একটি 'বিশেষ কমিটি' এবং একটি 'যৌথ কমিটি' গঠন করার কথা বলা হয়েছে। কাউন্সিলর পরিষদ একটি বিশেষ কমিটি গঠন করতে পারে। বিশেষ কমিটি নিয়োগ করা হয় বিশেষ কোন বিষয়ে তদন্ত করা অথবা সুনির্দিষ্ট কোন কাজ সম্পাদন করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে। কাউন্সিলররা এই কমিটির সদস্য হন না। কাউন্সিলর পরিষদ এমন ব্যক্তিকে এই কমিটির সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যাঁর বিশেষ জ্ঞান আছে।

রাজ্য সরকার প্রয়োজনবোধে একটি যৌথ কমিটি গঠন করতে পারেন। বিশেষ কোন বিষয়ে একাধিক পৌরসভার অথবা এক বা একাধিক পৌরসভা ও স্থানীয় কোন বা কতিপয় অন্যান্য কর্তৃপক্ষের অভিন্ন স্বার্থ থাকতে পারে। সে রকম ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের জন্য একটি যৌথ কমিটি করতে পারে। এই যৌথ কমিটির সদস্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ দু'জন করে প্রতিনিধি মনোনীত করে। তা ছাড়া এই কমিটির সদস্য হিসাবে রাজ্য সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহ প্রত্যেক বিভাগ একজন করে প্রতিনিধি মনোনীত করে। তা ছাড়া রাজ্য সরকার কর্তৃক মনোনীত এক বা একাধিক বিশেষজ্ঞ এই কমিটির সদস্য হন। আবার স্থানীয় সংস্থাগুলির ডাইরেক্টর কিংবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি এই কমিটির সদস্য হন।

পৌরসভার বিভিন্ন কর্মচারী : পৌরসভায় সাধারণত একজন করে নিম্নোক্ত পদাধিকারিদের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। এরা হলেন : (ক) নির্বাহী আধিকারিক (Executive Offier), (খ) রাজস্ব আধিকারিক (Finance Officer), (গ) সচিব (Secretary), (ঘ) প্রধান সহকারী (Head Assistant), (ঙ) অফিস তত্ত্বাবধায়ক (Office Superintendent), (চ) প্রধান করণিক (Head Clerk), (ছ) বাস্তুকার (Engineer), (জ) একজন বা একাধিক জন উপ-সহকারী বাস্তুকার (Sub-Assistant Engineer), (ঝ) নকশা-আঁকিয়ে (Draftsman) (ঞ) জরিপকারী (Surveyor), (ট) হিসাব পরীক্ষক (Accountant), (ঠ) স্বাস্থ্য আধিকারিক (Health Officer), (ড) চিকিৎসক (Medical Officer), (ঢ) একজন বা একাধিক জনস্বাস্থ্য পরিদর্শক (Sanitary Inspector)। তা ছাড়া রাজ্য সরকার প্রয়োজনবোধে অন্য যে কোন পদাধিকারীকে নিযুক্ত করতে পারেন। তেমনি আবার কোন পৌরসভার উল্লিখিত যে কোন আধিকারিক বা কর্মচারীর পদকে বাতিল করার জন্য রাজ্য সরকার নির্দেশ জারি করতে পারেন। আবার রাজ্য সরকার একটি পৌরসভা কৃত্যক কমিশন (Municipal Service Commission) গঠনের ব্যবস্থা করতে পারেন। একজন সভাপতি সমেত মোট তিনজনকে নিয়ে এই কমিশন গঠন করা যায়।

২০.৩. পৌরসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী(Powers and Functions of the Municipality)

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পৌর আইনে পৌরসভাগুলির হাতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। বর্তমান আইন অনুসারে পৌরসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী বহু ও বিভিন্ন। পৌরসভার কার্যাবলীকে এই আইনে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। ক্ষমতা ও কার্যাবলীর এই তিনটি ভাগ হল : (ক) বাধ্যতামূলক (Obligatory), (খ) স্বেচ্ছাধীন (Discretionary) এবং (গ) অর্পিত (Delegated)। ১৯৯৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের ৬৩ থেকে ৬৬ ধারার মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা আছে।

(ক) বাধ্যতামূলক কার্যাবলী (Obligatory Functions) : পৌরসভার বাধ্যতামূলক কার্যাবলী আবার চার ধরনের। পশ্চিমবঙ্গ পৌরসভা আইন (১৯৯৩)-এর ৬৩ ধারায় এ বিষয়ে আলোচনা আছে। পৌরসভার বাধ্যতামূলক কাজকর্মের তালিকায় ৪৯টি বিষয়ের উল্লেখ আছে। বাধ্যতামূলক কার্যাবলীর চারটি ধরন হল : (১) প্রশাসনিক, (২) উন্নয়নমূলক, (৩) জনকল্যাণমূলক এবং (৪) জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত।

(১) প্রশাসনিক (Administrative) : পৌরসভার কতকগুলি প্রশাসনিক কাজকর্ম আবশ্যিক। এগুলি হল : পৌর এলাকার সীমানা নির্ধারণ; পৌরসভার কার্যাবলী সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করা; প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পর্কিত তথ্যাদি সঙ্কলন ও নথিপত্র সংরক্ষণ; জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ; পৌরসভার সম্পত্তি ও সরকারী সম্পত্তি সংরক্ষণ; দূষণ নিয়ন্ত্রণ; বে-আইনী গৃহনির্মাণ রোধ; সর্বসাধারণের জায়গায় বে-আইনী দখলদারী প্রতিরোধ; পৌর পরিষেবাসমূহের অপচয় রোধ; পুরকর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা; বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় দিবস পালন; অগ্নি নির্বাপনের ব্যাপারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি অবলম্বন; জমি ও বাস্তু জরিপ করে নক্‌সা তৈরি করা এবং কোন বাস্তু বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ালে তা নষ্ট করা।

(২) উন্নয়নমূলক (Developmental) : পৌরসভাকে নগর-পরিকল্পনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতকগুলি আবশ্যিক কার্য সম্পাদন করতে হয়। এগুলি হল : পৌরসভার এলাকার অভ্যন্তরে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন; পৌরসভার সীমানা সংলগ্ন এলাকার বিধিসম্মত বিকাশের ব্যবস্থা; অপরিচ্ছন্ন এলাকার উন্নয়ন; বস্তি উন্নয়ন; নতুন অঞ্চলের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ; পথের যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ; পরিষেবামূলক সংস্থাসমূহের সঙ্গে সহযোগিতা; কেব্‌ল লাইন, পাইপ লাইন, টিউব প্রভৃতি প্রস্তুত ও রক্ষণাবেক্ষণকারী সংস্থাসমূহের সঙ্গে সহযোগিতা; ঐতিহ্যপূর্ণ স্থান ও স্মারক বস্তুসমূহ সংরক্ষণ; পৌর এলাকায় উদ্যান, পার্ক প্রভৃতি সৃষ্টি ও সংরক্ষণ; শহরের শ্রীবৃদ্ধির উপযোগী গঠনমূলক কার্য সম্পাদন এবং ঘরবাড়ী তৈরী ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।

(৩) জনকল্যাণমূলক (Public Works) : পুর কর্তৃপক্ষকে কতকগুলি জনকল্যাণমূলক পূর্ত কার্য সম্পাদন করতে হয়। এগুলিও আবশ্যিক প্রকৃতির। জনকল্যাণমূলক এই কার্যাবলী হল : জল সরবরাহ; সর্বসাধারণের জন্য শৌচাগার সৃষ্টি ও সংরক্ষণ; পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; পৌর এলাকায় বাজার, কসাই খানা প্রভৃতি নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; পথঘাট, কালভার্ট প্রভৃতি নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; পথঘাট আলোকিত করা; ঘরবাড়ীর নম্বর নির্ধারণ ও রাস্তার নামকরণ; ঐতিহ্যপূর্ণ সৌধসমূহ সংরক্ষণ এবং রাস্তাঘাটের দু'ধারে বৃক্ষরোপণ।

(৪) জনস্বাস্থ্য (Public Health) : জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু আবশ্যিক কার্য পৌরসভাকে সম্পাদন করতে হয়। এগুলি হল : পৌর এলাকায় সর্বসাধারণের ব্যবহার্য শৌচালয়গুলির সংস্কার সাধন; দূষণকারী তরল ও কঠিন যাবতীয় বর্জ্য পদার্থ অপসারণ; রোগ প্রতিরোধের জন্য টীকা দানের ব্যবস্থা এবং মারাত্মক

রোগসমূহ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা; পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহ; মৃতদেহ সৎকার; পথঘাট ও সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানসমূহ পরিষ্কার করা ও রাখা; সর্বসাধারণের ব্যবহার্য জলের যাবতীয় উৎস সংরক্ষণ; অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ; কুকুর ও অন্যান্য জীবজন্তুর উপদ্রব রোধ এবং বিপজ্জনক ব্যবসাপত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা।

(খ) স্বেচ্ছাধীন কার্যাবলী (Discretionary Functions) ঃ পৌরসভার স্বেচ্ছাধীন কার্যাবলীর তালিকায় ৪১টি বিষয়ের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। পৌরসভার স্বেচ্ছামূলক কার্যাবলী আবার পাঁচ ভাগে বিভক্ত। এই পাঁচ ধরনের কার্যাবলী হল ঃ (১) প্রশাসনিক, (২) উন্নয়নমূলক, (৩) জনকল্যাণমূলক, (৪) জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত এবং (৫) শিক্ষা সম্পর্কিত। এ বিষয়ে ১৯৯৩ সালের পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইনের ৬৪ ধারায় আলোচনা আছে।

(১) প্রশাসনিক কার্যাবলী ঃ পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যাবলী হল ঃ যাদুঘর প্রভৃতি নির্মাণ ও সংরক্ষণ; মাদকাশক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ; গুণিজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও গুণিজনের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা; সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে স্বেচ্ছাশ্রমের সংগঠন ও সমন্বয় সাধন; যানবাহনের সেড সৃষ্টি ও সংরক্ষণ এবং মেলা ও প্রদর্শনী সংগঠন।

(২) জনকল্যাণমূলক কার্যাবলী ঃ পৌরসভার কর্মচারীদের আবাসনের ব্যবস্থা হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রসূতিসদন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ; পাঠাগার, দোকান-বাজার, কর্মশালা, যাদুঘর, প্রতীক্ষালয় প্রভৃতি নির্মাণ ও সংরক্ষণ; যানবাহন ব্যবস্থা; অল্প ব্যয়ে অনগ্রসর শ্রেণীর ব্যক্তিদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা; বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহের ব্যাপারে ব্যবস্থা এবং অনাথ আশ্রম ও বৃদ্ধ নিবাসের ব্যবস্থা।

(৩) উন্নয়নমূলক কার্যাবলী ঃ অক্ষম, অনাথ ও গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ; ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ সাধন; শহর উন্নয়নের পরিকল্পনা ও আঞ্চলিক উন্নয়নের পরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় সাধন; সমবায় সমিতিসমূহের বিকাশ সাধন; অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলাদের জন্য রোজগারের ব্যবস্থা; ইমারতী দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও সঠিক দামে বণ্টনের ব্যবস্থা; গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; সামাজিক বনসৃজন ও পতিত জমি উদ্ধার; ভবঘুরেদের পুনর্বাসন; চাষ-আবাদ ও হাঁস-মুরগী পালনের উন্নতি সাধন ও নার্শারী সৃষ্টি ও সংরক্ষণ এবং পুষ্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা।

(৪) জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত কার্যাবলী ঃ পরিশ্রুত পানীয় ও অপরিশ্রুত জল সরবরাহ; অ্যাম্বুল্যান্স সার্ভিসের ব্যবস্থা; দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা; ধোঁয়া-দূষণ রোধের ব্যবস্থা; জৈব সার সৃষ্টির জন্য বর্জ্য বস্তু ব্যবহার এবং অচিরাচরিত শক্তিসমূহের ব্যবহার বৃদ্ধি।

(৫) শিক্ষা সম্পর্কিত কার্যাবলী ঃ প্রথাবহির্ভূত ও সামাজিক শিক্ষার ব্যবস্থা; প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষায়তন সৃষ্টি ও সংরক্ষণ; সাংস্কৃতিক ও শারীর শিক্ষার বিকাশ সাধন; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সাধন; পুস্তক, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি ক্রয় এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সভার আয়োজন।

(গ) অর্পিত কার্যাবলী (Delegated Functions) ঃ আবার রাজ্য সরকার কতকগুলি কাজকর্মের দায়িত্ব ও ক্ষমতা পৌরসভার হাতে অর্পণ করতে পারে। এ ধরনের কার্যাবলীর তালিকায় ১৭টি বিষয় বর্তমান। পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন (১৯৯৩)-এর ৬৫ ধারায় এ বিষয়ে আলোচনা আছে। পৌরসভার অর্পিত কার্যাবলী হল ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ; নগর পরিকল্পনা; অসামরিক প্রতিরক্ষা ও অগ্নি নির্বাপন; নগর উন্নয়ন; খাদ্য সামগ্রীর সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ; জল সরবরাহ ব্যবস্থা, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ; ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ; যানবাহন ব্যবস্থা; পূর্ত বিষয়ক কার্যাবলী; বিবিধ শিক্ষা সম্পর্কিত কর্মসূচী; সামাজিক বনসৃজন; পরিবেশ উন্নয়ন; কর্মসংস্থান পরিকল্পনা; ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং তফসিলী জাতি ও উপজাতি কল্যাণ। উল্লিখিত সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের দায়িত্ব রাজ্য সরকার পৌরসভার উপর ন্যস্ত করতে পারে। সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব সম্পাদন করতে পৌরসভা বাধ্য। তবে রাজ্য সরকার এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কর্মী ও অর্থ সরবরাহ করে।

ছোট ছোট শহরাঞ্চলের উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব পৌরসভাগুলির হাতে ন্যস্ত আছে। এই সমস্ত কাজকর্মের উদ্দেশ্য হল নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান।

পৌরসভার আয়ের উৎসসমূহ (Sources of Income of M